পাক্ষিক

আহমদী

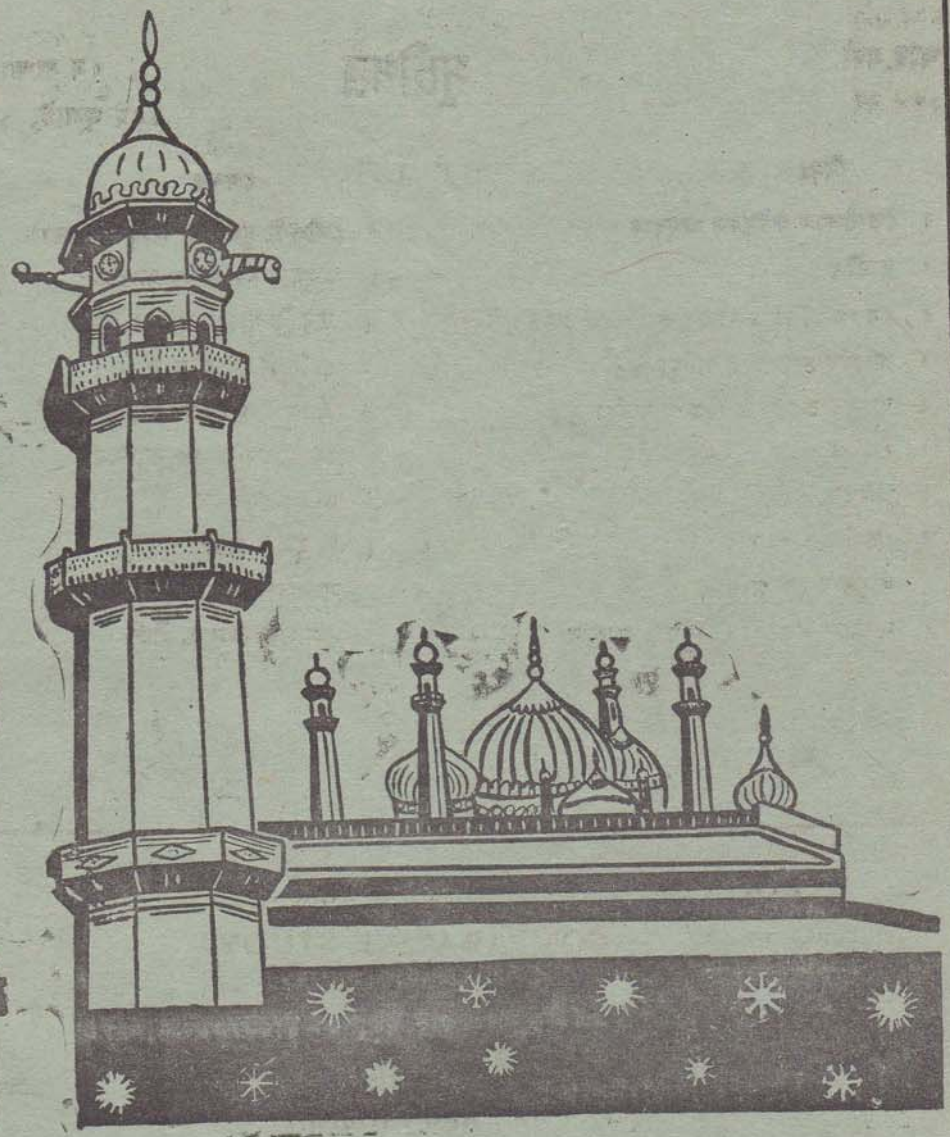

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা

৫ম সংখ্যা
১৫ই জুলাই, ১৯৬৯ :

বার্ষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২৩শ বর্ষ

সূচীপত্র

৫ম সংখ্যা
১৫ই জুলাই, ১৯৬৯ :

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কোরআন করীমের অনুবাদ	মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	১১৩
হাদীস	অনুবাদক—বশির আহ্‌মদ	১১৫
হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী	তবলীগে হক, হইতে উদ্ধৃত	১১৭
আল্লাহতায়ালার অস্তিত্ব	মৌলবী মোহাম্মাদ	১১৮
আন্‌সারুল্লার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য	মকবুল আহমদ খান	১২৮
ধর্ম ও অধর্ম	মোহাম্মদ আবুল কাসেম	১৩২
ফেরেশ্‌তা	রফিক আহমদ	১৩৭
ছোটদের পাতা	আহ্‌মদী জগৎ	১৩৯
মাহ্‌দীর জয় গান	সরফরাজ এম, এ, সাত্তার	১৪৩
নুসরতে এলাহী (খোদার সাহায্য)	কুদসিয়া বিন্‌তে মীর্জা	১৪৪

For

COMPARATIVE STUDY

Of

WORLD RELIGIONS

Best Monthly

THE REVIEW OF RELIGIONS

Published from

RABWAH (West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় ঃ ২৩শ বর্ষ ঃ ১৫ই জুলাই ঃ ১৯৬৯ সন ঃ ১৫ই ওফা ঃ ১৩৪৮ হিজরী শামসী ঃ ৫ম সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

সূরা ইউসুফ

১২শ রুকু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১০৬ ॥ এবং আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীতে বহুবিধ নিদর্শন বিদ্যমান আছে, যেগুলি হইতে তাহারা মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়।

১০৭ ॥ এবং তাহাদের অধিকাংশ লোকই আল্লার উপর ঈমান আনে না, তাঁহার সহিত শরীক না করিয়া।

১০৮ ॥ তাহারা কি (ইহা হইতে) নিঃশঙ্ক ও নিরাপদ হইয়া গিয়াছে যে, আল্লার আযাব আসিয়া তাহাদিগকে ঢাকিয়া ফেলিবে অথবা সেই নির্ধারিত সময় এমন অবস্থায় তাহাদের নিকট হঠাৎ আসিয়া পড়িবে যে, তাহারা নির্ধারণ করিতে পারিবে না।

১০৯ ॥ তুমি বল, ইহাই আমার পথ, আমি আল্লার দিকে আহ্বান করিতেছি, নিশ্চিত জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আমি এবং আমার অনুগামিগণ এবং আল্লাহ্ সর্বপ্রকার ত্রুটী হইতে পবিত্র এবং আমি অংশীবাদী লোকদের অন্তরভূক্ত নহি।

১১০ ॥ এবং আমরা তোমার পূর্বে জনপদ সমূহের অধিবাসী বৃন্দের মধ্য হইতে শুধু পুরুষগণের নিকট ওহী নাযেল করিয়া রসুল রূপে প্রেরণ করিয়াছি। তাহারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে নাই? তাহা হইলে তাহারা দেখিতে পাইত তাহাদের পূর্ববর্তী (নবীগনের অস্বীকার কারীদের) কিরূপ (ভয়াবহ) পরিণাম হইয়া ছিল। এবং নিশ্চয় ধর্ম পরায়ণদের জন্য পরকালে বাসস্থান অধিকতর উত্তম। তোমরা কি বুদ্ধি প্রয়োগ করিবে না।

১১১ ॥ এমনকি যখন একদিকে রসুলগণ (বিরুদ্ধ-বাদীদের সম্বন্ধে) একেবারে নিরাশ হইয়া গেল এবং (অন্যদিকে) অস্বীকারকারীগণ (নিশ্চিত ভাবে) ধারণা করিয়া নিল যে (ওহীর নামে) তাহাদিগকে মিথ্যাকথা বলা হইয়াছে তখন সেই রসুলগণের নিকট আমার সাহায্য আসিয়াছিল এবং যাহাদিগকে রক্ষা করার আমার ইচ্ছা ছিল, তাহারা রক্ষা পাইল এবং পাপাচারী লোকদের উপর হইতে আমার শাস্তি কখনও নির্বারিত হয় না।

১১২ ॥ এবং নিশ্চয় তাহাদের বর্ণনা সমূহে বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের জন্য উপদেশ বিদ্যমান আছে। ইহা এমন বাক্য নহে যে বানানো হইয়াছে বরং ইহা তাহার পূর্ববর্তী ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের সত্যতা প্রতিপন্নকারী এবং প্রত্যেক বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনাকারী এবং যাহারা (সমাগত নবীর উপর) বিশ্বাস স্থাপন করে তাহাদের জন্য হেদায়ত এবং রহমত।

★

॥ হাদিস ॥

নামায

ইহার শর্ত এবং ইহার আদব

অনুবাদক ঃ—বশির আহ্‌মদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(১)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা রসুল করীম (সাঃ) মসজিদে অবস্থান করিতেছিলেন। এমন সময়ে একজন মানুষ আসিল এবং সে নামায পড়িল। অতঃপর সে রসুল করীম (সঃ)-এর নিকটে আসিল এবং তাঁহাকে সালাম করিল। হুযুর তাহার সালামের উত্তর দিলেন এবং বলিলেন, যাও, আবার নামায পড়, কেননা তোমার নামায হয় নাই। অতঃপর সে গেল এবং নামায পড়িল এবং রসুল করীম (সাঃ)-কে সালাম করিল। তিনি তাহার সালামের উত্তর দিলেন এবং বলিলেন যাও, আবার নামায পড়। তুমি নামায পড় নাই। এইভাবে তিনবার হইল। তখন সেই ব্যক্তি বলিল, সেই অস্তিত্বের কসম যিনি আপনাকে সত্যতার নিদর্শনাবলীর সহিত প্রেরণ করিয়াছেন, আমি ইহার চাইতে ভাল নামায পড়িতে পারি না। সুতরাং আপনিই আমাকে নামায পড়িবার জন্য ইহার সঠিক পন্থা বলিয়া দিন। অতঃপর তিনি বলিলেন যখন তুমি নামায পড়িবার জন্য দাঁড়াও তখন "তকবীর" (আল্লাহু আকবার) বল। অতঃপর যতটুকু পার কোরআন পাঠ কর। অতঃপর সম্পূর্ণ স্থিরচিত্তে রুকু কর। অতঃপর সোজা হইয়া দাঁড়াও। অতঃপর সম্পূর্ণ স্থির চিত্তে সেজদা কর, সেজদা হইতে উঠিয়া সোজা হইয়া বস। তারপর দ্বিতীয় সেজদা কর। এইভাবে সমস্ত নামায ধীরে ধীরে এবং সুন্দরভাবে পড়। (বুখারী)।

(২)

হযরত মায়াবিয়া-বিন-হাকান (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা আমি রসুল করীম (সাঃ)-এর ইমামতিতে নামায পড়িতেছিলাম। সেই সময় এক ব্যক্তি হাঁচি দিল। আমি তার উত্তরে বলিলাম يرحمك الله অর্থাৎ আল্লাহ্‌তায়ালা তোমার উপরে রহম করুন। অন্য নামাযী আমারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। আমি বলিলাম, তোমাদের মাতার মৃত্যু হউক। তোমরা আমাকে এইভাবে কেন দেখিতেছ। তখন তাহারা হা হুতাশ করিতে লাগিল, যেভাবে লোক অস্থিরতা এবং দুশ্চিন্তার সময় করিয়া থাকে। তখন আমি বুঝিলাম তাহারা প্রকৃতপক্ষে আমায় চুপ করাইতে চাহে। যখন রসুল করীম (সাঃ) নামায শেষ করিলেন, তখন তিনি আমাকে ডাকিলেন। আমার মাতাপিতা তাঁহার উপর উৎসর্গ হউক। আমি ইহার পূর্বে এবং ইহার পরে তাঁহার অপেক্ষা রহম দীল এবং সর্ব উৎকৃষ্ট শিক্ষক দেখি নাই। খোদার কসম তিনি আমাকে না ধমক্ দিলেন, না মারিলেন, না গালমন্দ দিলেন। পরন্তু বড় স্নেহের সাথে বলিলেন, "নামাযের মধ্যে কথা বলা ঠিক না, নামাযে "তসবীহ্" (অর্থাৎ আল্লাহ্‌তায়ালার প্রশংসা করা) "তকবীর"

এবং কোরআন শরীফের তেলাওয়াত হয়।" আমি বলিলাম, হুযুর আমি নুতন মুসলমান হইয়াছি, এখন পর্যন্ত জাহেলিয়াতের জামানার নিকটে আছি। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে ইসলামের ধন এবং নেয়ামতের অংশীদার করিয়াছেন। আমাদের মধ্য হইতে কিছু সংখ্যক লোক সন্ন্যাসী এবং জ্যোতিষীদের নিকট যায়। তিনি বলিলেন, তুমি তাহাদের কাছে যাইও না। আমি বলিলাম আমাদের মধ্য হইতে কিছু সংখ্যক লোক ভবিষ্যৎভাগ্য নির্ধারণের জন্য পরামর্শ লইয়া থাকে। তিনি বলিলেন, এই সমস্ত কথা হৃদয়ে নানা প্রকার ভাবের উদ্রেক করে। কিন্তু ইহার জন্য সেই সকল খেয়ালী কথায় পড়িয়া কাজকর্ম হইতে বিরত হওয়া উচিৎ নহে। (মুসলিম)।

(৩)

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, জমাতের সহিত নামায পড়া একা নামায পড়ার চাইতে সাতাইশ গুণ বেশী সওয়াবের কারণ। (মুসলিম)।

(৪)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, যখন ফরজ নামায শুরু হইয়া যায়, তখন ফরজ নামায ছাড়া অন্য কোন নামায পড়া জায়েয নহে। (মুসলিম)।

(৫)

হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সকলের চেয়ে বেশী কোরআন জানে সেই ব্যক্তি যেন নামাযের ঈমাম হয়। যদি সবাই কোরআনের শিক্ষায় সমান হয় তখন সেই ব্যক্তি নামায পড়াইবে যাহার সুন্নতের জ্ঞান বেশী। যদি ইহার মধ্যেও সমান হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ইমাম হইবে, যে সর্ব প্রথম হিজরত করিয়াছে। যদি হিজরতেও সবাই সমান হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ইমাম হইবে যার বয়স সব চাইতে বেশী। কোন ব্যক্তি অন্য কাহারও এলেকায় ইমাম হইবার লালসা না করে এবং কোন ব্যক্তির ঘরে তাহার অনুমতি ব্যতিরেকে তাহার আসনে না বসে।

(মুসলিম)।

(ক্রমশঃ)

★

হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী

জগতের অভিশাপকে তোমরা ভয় করিও না

জগতের অভিশাপকে তোমরা ভয় করিও না; কারণ, উহা দেখিতে দেখিতে ধূম্রের ন্যায় বিলীন হইয়া যায়। তাহারা কখনও দিবাকে রাত্রি করিতে পারে না। বরং তোমরা আল্লাহ্‌র অভিসম্পাতকে ভয় কর, যাহা আকাশ হইতে অবতীর্ণ হয় এবং যাহার উপর উহা নিপতিত হয়, তাহার ইহকাল ও পরকালকে সমূলে বিনষ্ট করে। তুমি কপটতা দ্বারা নিজকে রক্ষা করিতে পারিবে না, কারণ যিনি তোমাদের খোদা, তিনি মানব হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্যন্ত দেখিয়া থাকেন। তোমরা কি তাঁহাকে প্রতারণা করিতে পার? সুতরাং তোমাদের পরিষ্কার, সরল, পবিত্র এবং নির্ম্মল হইয়া যাও। যদি তোমরা মধ্যে অন্ধকারের এক কণা মাত্রও অবশিষ্ট থাকে, তবে তাহা তোমাদের হৃদয়ের সমস্ত জ্যোতিকে নষ্ট করিয়া দিবে। যদি তোমাদের হৃদয়ের কোন অংশে অহঙ্কার, কপটতা, আত্মশ্লাঘা বা আলস্য বর্তমান থাকে, তবে তোমরা তাঁহার গ্রহণের আদৌ উপযুক্ত হইবে না। দেখ তোমরা যেন মাত্র কয়েকটি কথা শিখিয়া আত্মপ্রতারণা না কর যে, তোমরা তোমাদের কর্তব্য সাধন করিয়াছ। আল্লাহ্ চাহেন যেন তোমাদের জীবনে আমূল পরিবর্তন আসে। তিনি তোমাদের নিকট হইতে এক মৃত্যু চাহেন। ইহার পর তিনি তোমাদিগকে এক নূতন জীবন দান করিবেন। যত শীঘ্র সম্ভব তোমাদের পরস্পরের বিবাদ মিমাংসা করিয়া ফেল এবং নিজ ভ্রাতাকে ক্ষমা কর। কারণ, যে ব্যক্তি আপন ভ্রাতার সহিত বিবাদ মীমাংসা করিতে প্রস্তুত নহে, সে নিশ্চয় অসাধু। সে সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে, সুতরাং সে সম্বন্ধচ্যুত হইয়া যাইবে। তোমরা নিজ নিজ রিপুর বশবর্তীতা সর্বোতভাবে পরিহার কর এবং আপোষের মনোমালিন্য পরিত্যাগ কর এবং সত্যবাদী হইয়াও মিথ্যাবাদীর ন্যায় বিনয়াবনত হও, যেন তোমরা ক্ষমার অধিকারী হইতে পার। তোমরা রিপুর স্থূলতা বর্জ্জন কর, কারণ যে দ্বার দিয়া তোমাদিগকে আহ্বান করা হইয়াছে, সে দ্বার দিয়া কোন স্থূলরিপু ব্যক্তি প্রবেশ করিতে পারিবে না। কত হতভাগ্য সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌র মুখনিসৃত বাণী, যাহা আমার দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে, মানিতে প্রস্তুত নহে। তোমরা যদি ইচ্ছা কর যে, আকাশে আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, তবে তোমার পরস্পর সহোদর ভাইয়ের মত হইয়া যাও। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই অধিক মহৎ, যে নিজের ভ্রাতার অপরাধ অধিক ক্ষমা করে, এবং অধিক দুর্ভাগা সেই ব্যক্তি, যে হঠকারিতা করে এবং নিজের ভ্রাতার অপরাধ ক্ষমা করিতে প্রস্তুত নহে। তদ্রূপ ব্যক্তির সহিত আমার কোন সংস্রব নাই। খোদাতায়ালার অভিশাপ হইতে সর্বদা অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকিও। কারণ, তিনি অতি পবিত্র এবং আত্মমর্যাদাভিমানী। পাপকারী কখনও খোদার নৈকট্য লাভ করিতে পারে না। অহঙ্কারী কখনও তাঁহার নৈকট্য লাভ করিতে পারে না। অত্যাচারী তাঁহার নৈকট্য লাভ করিতে পারে না। বিশ্বাসঘাতক কখনও তাঁহার নৈকট্য লাভ করিতে পারে না। যে কেহ তাঁহার নামের সম্মান রক্ষা করিতে ব্যগ্র নহে, সে কখনও তাঁহার নৈকট্য লাভ করিতে পারে না। যাহারা কুকুর বা পিপিলীকা বা শকুনের মত সংসারাসক্ত এবং সংসার-সম্ভোগে নিমগ্ন, তাহারা কখনও তাঁহার নৈকট্য লাভ করিতে

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

॥ আল্লাহতায়ালার অস্তিত্ব ॥

মৌলবী মোহাম্মাদ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

রক্ষাকারী

আল্লাহ্‌তায়ালার এক নাম হাফিয অর্থাৎ রক্ষাকারী। নবীদের জীবন আল্লাহ্‌তায়ালার হেফাযতের দৃষ্টান্তে ভরা। এগুলি কোনো মামুলী ধরণের ঘটনা নহে, যাহা নিত্য দেখা যায়। এগুলি কোনো দৈবাতের ঘটনাও নহে, যাহা উড়াইয়া দেওয়া যায়। এগুলি অলৌকিক ধরণের হইয়া থাকে এবং পূর্ব হইতে তাঁহাদিগের প্রতি আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশ ও হেফাযতের ওয়াদা দেওয়া থাকে। আমরা এ সম্বন্ধে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর জীবনের দৃষ্টান্ত আলোচনা করিব।

আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে জনগণের নিকট তাঁহার বাণী পৌঁছাইবার জোরদার তাকিদ দিয়া জনগণের চক্রান্ত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় অভয় দেন।

يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك - و ان لم تفعل فما بلغت رسالته ط و الله يعصمك من الناس ط

(অমৃতবাণীর অবশিষ্ট্য)

পারে না। প্রত্যেক অপবিত্র চক্ষু তাঁহা হইতে দূরে। প্রত্যেক পাপাসক্ত মন তাঁহার সমন্ধে অজ্ঞ। যে ব্যক্তি তাঁহার জন্য অগ্নিতে নিপতিত, তাহাকে অগ্নি হইতে মুক্তি দেওয়া হইবে। যে তাঁহার জন্য কাঁদে, সে অবশ্য হাসিবে। যে ব্যক্তি তাঁহার উদ্দেশ্যে সংসার বর্জ্জন করে, সে নিশ্চয় তাঁহাকে লাভ করিবে। তোমরা আন্তরিকতা, পূর্ণ সরলতা এবং উৎসাহের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব লাভ করিতে অগ্রসর হও, তাহা হইলে তিনিও তোমাদের বন্ধু হইবেন। তোমরা নিজ অধীন ব্যক্তিদের প্রতি, তোমাদের স্ত্রী পরিজন এবং গরীব্ ভাইদের প্রতি দয়া কর, যেন আকাশে তিনিও তোমাদের উপর দয়া করেন। তোমরা যথার্থই তাঁহার হইয়া যাও, যেন তিনিও তোমাদের হইয়া যান। জগৎ বহু বিপদের স্থান। অতএব তোমরা একনিষ্ঠার সহিত আল্লাহর দিকে ধাবমান হও, যেন তিনি এই বিপদরাশী হইতে তোমাদিগকে দূরে রাখেন। জগতে কোন বিপদ দেখা দেয় না, যে পর্যন্ত আকাশে তদ্বিষয়ে আদেশ না হয় এবং কোন বিপদ জগৎ হইতে দূর হয় না, যে পর্যন্ত আকাশ হইতে তাঁহার দয়া বর্ষণ না হয়। সুতরাং তোমাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ইহাই যে, তোমরা শাখাকে অবলম্বন না করিয়া মূলকে অবলম্বন কর। তোমাদের জন্য ঔষধ এবং উপকরণের ব্যবহার নিষিদ্ধ নহে। কিন্তু উহাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ। কারণ, পরিশেষে তাহাই অবশ্য ঘটিবে, যাহা তিনি ইচ্ছা করেন। যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ নির্ভরের শক্তি রাখে, তবে তদ্রূপ নির্ভরতার স্থান সর্বোচ্চ, সন্দেহ নাই।

★

"হে রসুল! তোমার প্রভুর পক্ষ হইতে তোমার উপর যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে উহা জনগণের নিকট প্রচার কর এবং যদি তাহা না কর, তাহা হইলে তুমি তাঁহার প্রচারবাণী একেবারেই পৌঁছাও নাই। এবং আল্লাহ্ তোমাকে (ষড়যন্ত্রকারী) মানুষ হইতে রক্ষা করিবেন।" (সুরা মায়েদা, ৯ম রুকু)।

হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর তবলীগ যখন জোরদার হইয়া ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল, তখন মক্কাবাসীগণ তাঁহাকে হত্যা করিবার গোপন ষড়যন্ত্র করিল। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহাকে যথাসময়ে এ সংবাদ জানাইয়া হিজরত করিতে আদেশ দিলেন।

রাত্রির অন্ধকারে হত্যাকারীর দল হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর ঘরের চারিদিকে পাহারা দিতেছিল যেন প্রভাতে তিনি গৃহ হইতে বাহির হওয়ার কালীন তাঁহাকে তাহারা সকলে মিলিতভাবে একযোগে হত্যা করিতে পারে। এদিকে হযরত রসুল করীম (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে নিজ বিছানায় শোয়াইয়া হিজরতের জন্য গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পাহারা-রত নিকটবর্তী এক শত্রু তাঁহাকে বাহির হইতে দেখিয়া তাঁহাকে অন্য লোক ভাবিয়া, তাহারা যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে উহা ফাঁশ হইয়া যাইবার ভয়ে এবং সন্দেহ এড়াইবার জন্য তাঁহার দিকে না তাকাইয়া ভিন্ন দিকে মুখ ফিরাইয়া সরিয়া গেল। এদিকে হযরত রসুল করীম (সাঃ) কোন দিকে না তাকাইয়া নির্ভিক-চিত্তে দৃঢ় পদবিক্ষেপে তাহার পাশ কাটাইয়া শত্রু ব্যূহ ভেদ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে চলিয়া গেলেন। যাঁহাকে শত্রু মারিতে আসিয়াছিল, তাঁহাকে সসম্মানে যাইতে পথ ছাড়িয়া দিয়া সকলে সারারাত্রি খালি গৃহের পাহারা দিল। ভয়ে যাঁহার ভীত হওয়ার কথা, তিনি সম্মুখ দিয়া নির্ভয়ে চলিয়া যান, এবং পৈশাচিক দুঃসাহসে যে তাহাকে মারিতে আসিল, যে ভয়ে সরিয়া গেল। অন্ধকারের মধ্যে অস্ত্রের এক আঘাতেই তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া হইত। কিন্তু বুদ্ধি তাহার সহায় হইল না, দৃষ্টি তাহার কাজে লাগিল না, অস্ত্র তাহার খাপে রহিয়া গেল, বধ্যকে সে পথ ছাড়িয়া দিল। কে তাহাকে এমন করিয়া বেকুব করিয়া দিল? কে তাহার বুদ্ধি ও বাহ্য দৃষ্টির উপর অলক্ষ্য হাতে পরদা টানিয়া দিল? ফেরাউনও এমনি বেকুব হইয়াছিল। সে যে মুসা (আঃ) কে হত্যা করিতে তাহার রাজ্যের বনিইসাইলের নবজাত শিশুগণকে মারিয়া শেষ করিতে লাগিল, সেই একই অলক্ষ্য হাত তাঁহাকে আনিয়া তাহার সামনে ধরিয়া দিল। দুশমনকে মারিবার মহান সুযোগ উপস্থিত। কিন্তু তরবারী খাপে আবদ্ধ রহিয়া গেল। পলকে তাহার মনের হিংসার দুয়ারে স্নেহের ঝালর ঝুলিয়া গেল। মুসা (আঃ) তাহার পালক পুত্র হইয়া গেল।

প্রভাতে যখন মক্কাবাসীগণ বুঝিতে পারিল যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) মক্কা ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন, তখন আবার নূতন উদ্যমে ক্রোধ ও হিংসায় উন্মত্ত হইয়া তাহারা তাঁহার সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িল। পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া পলাতক ধৃত করার এক বিদ্যাবিশারদকে তাহারা সঙ্গে লইয়া চলিল। পথপ্রদর্শক এরূপ সুদক্ষ ছিল যে সে বালুকার উপর হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর পদচিহ্ন নির্ভুল-ভাবে অনুসরণ করিয়া সকলকে লইয়া সোজা সওর নামক গিরি গুহার উপরে গিয়া পৌঁছিল। ইহারই তলদেশে হযরত রসুল করীম (সাঃ) ও হযরত আবু বকর (রাঃ) আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। গুহাটি প্রায় ৪ হাত লম্বা এবং ২॥০ হাত চওড়া এবং টিলার উপর অবস্থিত। অনুসন্ধানকারীর দল গুহার কিনারায় গিয়া দাঁড়াইল। পথপ্রদর্শক জানাইল যে হযরত রসুল করীম (সাঃ) গুহার মধ্যে আছে। তাহারা নীচের দিকে তাকাইলেই তাঁহাকে দেখিতে পাইত। গুহার উপরে দুশমনদের কথাবার্তা শুনিয়া

হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর জীবনের জন্য শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু শঙ্কা যাঁহার জন্য, তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার উপর অটল বিশ্বাসে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল এবং তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে বিরাজ করিতে ছিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) ভীতি প্রকাশ করিলেন। হযরত রসুল করীম (সাঃ) তাঁহাকে অভয় দিলেন, لاتحزن ان الله معنا "সন্ত্রস্ত হইও না, আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন।"

(সুরা তওবা,—১৯শ রুকু)।

বস্তুতঃ ভয়েরই কথা। পলাইবার পথ নাই, আত্মরক্ষার কোন অস্ত্র নাই এবং সাহায্য করিবার কেহ নিকটে নাই। ইহা অপেক্ষা অধিক ভয়ের অবস্থা কাহারও জীবনে কি হইতে পারে! কিন্তু নির্ভরকারী জানিতেন না যে, কিভাবে তাঁহাদের রক্ষার ব্যবস্থা হইবে। কিন্তু এতটুকু তাঁহার সুনিশ্চিত জানা ছিল যে, নির্ভরদাতার হস্তে তাঁহারা সর্বাপেক্ষা নিরাপদ ব্যক্তি হইতেও নিরাপদ। মহান ও হাফিয খোদা দুশমনকে মশা মাছিও গণিলেন না। তিনি তাঁহার প্রেরিত পুরুষ ও তাঁহার সঙ্গীকে প্রাকৃতিক ঘটনা ধারার মধ্য দিয়া আড়াম্বরহীন পন্থায় অবহেলে উদ্ধার করিয়া লইলেন।

অবব্যহৃত গিরিগুহার মুখে জাল বুনা মাকড়সার স্বভাব। কেহ সে জাল ছিড়িয়া ফেলিলে, পলকে তাহারা উহার সংস্কার করিয়া ফেলে। দুশমনগণ যখন গিরিগুহার কিনারায় দণ্ডায়মান, তখন একান্ত এই পদ্ধতিতেই গুহার মুখ মাকড়সার জালে ঢাকা ছিল। হযরত রসুল করীম (সাঃ) ও হযরত আবু বকর (রাঃ) রাত্রে যখন গুহার মধ্যে অবতরণ করেন, তখন গুহার মুখের জাল ছিঁড়িয়া যায়। কিন্তু পরক্ষণেই আবার উহার সংস্কার হইয়া যায়।

অনুসন্ধানকারীর দল যখন গিরিগুহার মুখে মাকড়সার জাল দেখিল, তখন তাহারা বিশ্বাস করিতে চাহিল না যে গুহার মধ্যে কেহ আছে। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর পদচিহ্ন গুহা হইতে কোনো দিকে বহির্মুখী না থাকায়, পথপ্রদর্শক সর্দারগণের অবিশ্বাস লক্ষ্য করিয়া জোরের সহিত ঘোষণা করিল যে, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) হয় ঐ গুহায় আছেন, নচেৎ তিনি পৃথিবীতে নাই, আকাশে চলিয়া গিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া তাহারা অট্টহাস্য হাসিয়া বলিল, তাহার আজ মতিভ্রম হইয়াছে। এই গুহার মধ্যে মানুষ প্রবেশ করিলে মাকড়সার জাল অক্ষুণ্ণ থাকিত না। তাহারা বুদ্ধির অহঙ্কারে আর গুহার মধ্যে দৃষ্টিপাত করিল না। পথপ্রদর্শকের যদিও মতিভ্রম হয় নাই, কিন্তু হাস্যাস্পদ হইয়া তাহার সত্যই মতিভ্রম হইল এবং তাহার দাবী সাব্যস্ত করিতে এক মুহূর্তের জন্য সেও গুহার তলে দৃষ্টিপাত করিতে সাহস করিল না, পাছে তাহাকে আরও হাস্যাস্পদ হইতে হয়। সুতরাং সকলে সেখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চলিয়া গেল। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন ঃ

ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت

"নিশ্চয় দুর্বলতম গৃহ হইল মাকড়সার গৃহ।"

(সুরা আনকবুত—৪র্থ রুকু)।

আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে আকাশে উঠাইয়া লইলেন না, সেখানে মেজিনো বা সিগফ্রীড লাইন পাতিলেন না, অথবা গিরিগুহার মুখ লৌহ কপাট দিয়া বন্ধ করিলেন না। তিনি তাঁহার প্রিয় রসুলকে রক্ষা করিবার জন্য দুশমনের মোকাবেলায় একান্ত তুচ্ছ মাকড়সার জালের ঢাল ধরিলেন। একজন মূর্খেও এ রক্ষা ব্যবস্থা দেখিয়া হাসিবে। দুশমনও মাকড়সার জাল দেখিয়া হাসিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের সে হাসি খোদার ব্যবস্থার প্রতি ছিল না। পরন্তু খোদা তাহাদিগের বুদ্ধির অহঙ্কারের চূড়ায় বসিয়া

তাহাদের মুখে তাহাদিগের মূর্খতার বিরুদ্ধে স্বয়ং হাসিয়া গেলেন। তাহারা বুঝিল না, জ্ঞানের গরিমায় তাহারা নিজদিগকে মহা বুদ্ধিমান মনে করিয়া খোদার লীলায় বেকুবের কাজ করিয়া বিফল ফিরিয়া গেল। গুহার মুখে কোন ভীষণ দর্শন ব্যাঘ্র ভল্লুক ছিল না, কোন সিপাহী সান্ত্রী ছিল না এবং তোপ কামানও ছিল না, যাহার ভয়ে অনুসন্ধান-কারীগণ সেদিকে তাকাইতে পারে নাই। পলাতকের অনুসন্ধানে এত শ্রম স্বীকার করিয়া তাঁহার একান্ত নিকটে আসিয়া, তাঁহার সেখানে থাকার অভ্রান্ত প্রমাণ পাইয়াও তাহারা মুহূর্তের জন্য গুহার মধ্যে কেন দৃষ্টিপাত করিতে পারিল না? কেন তাহারা রিক্ত হস্তে ফিরিয়া গেল? কে তাহাদিগকে একান্ত সহজ অথচ আলৌকিক পন্থায় হাস্যাস্পদভাবে বিফল করিয়া বিদায় করিয়া দিল? তাহাদের মূর্খতায় আজ মূর্খেও হাসিবে।

সর্বশক্তিমান খোদার হস্তে জগতের সর্বাপেক্ষা দুর্বলতম ঢাল, তাঁহার প্রিয় রসুলের হেফাযতের জন্য কি প্রকার দুর্ভেদ্য ঢালে পরিণত হয়, এই ঘটনায় তাহা দেখিবার পরও কি খোদার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে?

হিযরতের বিপদ এইখানেই শেষ হইল না। কোরেশগণ বিফল হইয়া হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে জীবিত বা মৃত যে কোন অবস্থায় যে আনিয়া দিবে তাহাকে একশত লোহিত বর্ণের উঁট পুরস্কার দিবার ঘোষণা করিল। এই ঘোষণা শুনিয়া সারাকা নামে এক ব্যক্তি তাঁহার অনুসন্ধানে অশ্বারোহণে মদীনার পথে বাহির হইয়া পড়িল। ইতিমধ্যে হযরত রসুল করীম (সাঃ) ও হযরত আবু বকর (রাঃ) পূর্ব বন্দোবস্ত অনুযায়ী আনিত উষ্ট্রের পৃষ্ঠে আরও দুইজন সঙ্গীসহ মদীনার পথে যাত্রা করিয়াছিলেন। সারাকা অশ্ব ছুটাইয়া তাঁহাদিগের নাগাল ধরিয়া ফেলিল। অদূরে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে দেখিয়া সারাকা তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাহাকে দেখিয়া বার বার পিছনে ফিরিয়া তাকাইতেছিলেন, কিন্তু হযরত রসুল করীম (সাঃ) নির্বিকারচিত্তে পবিত্র কুরআন তেলাওত করিয়া যাইতেছিলেন। সারাকা যেমন হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে আক্রমণ উদ্যত হইল, অমনি তাহার অশ্বের সম্মুখের পদদ্বয় বালির মধ্যে গাড়িয়া বসিয়া গেল। সারাকা নামিয়া ঘোড়াকে খাড়া করিয়া উহার উপর আরোহণ করিয়া অগ্রগামী হইয়া পুনঃরায় হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। পুনঃরায় ঘোড়ার সামনের পা বসিয়া গেল। এবারও ঘোড়াকে তুলিয়া উহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পুনঃরায় হযরত রসুল (সাঃ)-কে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে, ঘোড়ার পা আবার বসিয়া গেল। উপর্যুপরি তিনবার এইভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া এবং প্রত্যেক বার অদৃষ্ট পরীক্ষার জন্য তীর নিক্ষেপ করিয়া প্রত্যেকবার বিরূপ ফল দেখিয়া সে ভীত হইল। তাহার মনের মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিল। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর সত্যতার সম্বন্ধে তাহার হৃদয়ে প্রত্যয় নামিয়া আসিল। তাহার মনে হিংসার স্থানে অনুতাপের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। সে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর নশ্বর জীবন লইতে আসিয়াছিল, মহান নবী তাহাকে অমর জীবন দান করিয়া ফিরাইয়া দিলেন। সে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর নিকটে গিয়া ক্ষমাভিক্ষা করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিল।

সারাকা বড় আশা করিয়া আসিয়াছিল যে, সে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে ধরাইয়া দিয়া কোরেশকুল ঘোষিত একশত স্বর্ণ বর্ণের উঁট লাভ করিবে। ঈমান আনায় সে উহা হারাইয়া বসিল। সারাকা এ ক্ষতিকে তুচ্ছ জ্ঞান করিল, কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা উহাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিলেন না। ঈমান আনার জন্য হারানো পুরস্কারের বিনিময়ে

বান্দামনোরঞ্জনকারী খোদা তাহাকে এক অধিকতর মূল্যবান পুরস্কারের ওয়াদা দিলেন। যদিও ঈমানের সম্পদ, সকল সম্পদ হইতে মূল্যবান, তথাপি মর্যাদাভিমানী খোদা তাঁহার উপর ঈমান আনার জন্য কাহারও বিন্দুমাত্র আর্থিক ক্ষতির অভিযোগও নিজের এবং আপন রসুলের স্কন্ধে রাখেন না। তিনি তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক কৃত কুরবানীর বহুগুণ প্রতিদান দিয়া থাকেন। যখন ঈমান আনিয়া সারাকা ফিরিতে উদ্যত, তখন আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে ওহিযোগে জানালেন যে, পারস্যের বাদশাহ্‌ হরমুযের হস্তের স্বর্ণ-বলয় তাহার হস্তে পরানো হইবে। সারাকা মুশরেকগণের নিকট স্বর্ণ বর্ণের একশত উঁট লাভের আশায় ছাই দিয়া, স্বয়ং খোদার নিকট মহা-মূল্যবান খাঁটি-স্বর্ণের শাহী বলয় পুরস্কার লাভের অযাচিত ওয়াদা পাইলেন। সারাকার মনোরঞ্জন-কারী ছোট দুই কথার ভবিষ্যদ্বাণী সাম্রাজ্য ও জাতীয় উত্থান পতনের যে অসম্ভব সংবাদ দিল, উহা সর্বজ্ঞ, বিশ্বের নিয়ন্তা এবং জাতির উত্থান পতনের বিধাতা ছাড়া কাহার বলিবার ক্ষমতা ছিল? সমাগত বিপ্লব পার হইয়া সারাকা যে সেদিন পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিবে, তাহাই বা কে বলিতে পারিত? স্থান, কাল ও অবস্থা বিবেচনা করিলে কে ইহা কল্পনা করিতে পারিত এবং হযরত রসুল করীম (সাঃ) আল্লাহতায়ালার সত্য রসুল না হইলে এমন বিরূপ ও অসহায় অবস্থায় কি তিনি কখনও উক্ত সংবাদ প্রকাশ করিতে সাহস করিতেন। ইহার সুদীর্ঘ ১৬।১৭ বৎসর পর হযরত উমর (রাঃ)-এর যামানায় যখন পারস্য বিজয় হয়, তখন যুদ্ধে বীজিত সম্পদের মধ্যে পারস্যের বাদশাহ্‌ হরমুযের স্বর্ণ বলয় দুইটি আসে, যাহা বাদশাহ সিংহাসনে বসিবার সময় পরিধান করিতেন। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর নিকট আল্লাহ্‌তায়ালার দেওয়া ভবিষ্যদ্বাণীর ওয়াদা পুরণ করিবার জন্য হযরত উমর (রাঃ) সারাকাকে উহা পরিধান করান। আল্লাহ্‌তায়ালার ওয়াদা পূর্ণ হইল এবং রসুল করীম (সাঃ)-এর সত্যতার নিদর্শন অখণ্ডনীয়ভাবে প্রতিপন্ন হইল। বাহ্যতঃ ছোট এই ঘটনাটি অফুরন্ত আলোকের উৎস হইয়া রহিল। হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর জীবনের মহা সন্ধিক্ষণে এক বান্দার মনোরঞ্জনের জন্য এই ভবিষ্য-দ্বাণীর মধ্যে যে মনোভাব, পর্যবেক্ষণকারী সূক্ষ্ম দৃষ্টি, মর্যাদাভিমান, মহাদানশীলতা, ভবিষ্যদজ্ঞান, প্রতাপ, মহিমা ও শক্তির পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা এক অন্ধেরও চক্ষেও আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্বের অনির্বান আলো জ্বালাইয়া দিবে। স্বর্ণবলয় দুইটি সোজা পথে সারাকার হস্তে উঠে নাই। বহু জন ও জাতির ভাগ্য বিপর্যয় ঘটাইয়া উহা তাহার হস্তে উঠিয়াছিল। বলয় দুইটিকে জগৎ স্বর্ণ বর্ণ উটের বিনিময় স্বরূপ মহা-মূল্যবান ও ঐতিহাসিক স্বর্ণালঙ্কাররূপে দেখিবে, কিন্তু সাধুগণ সারাকার হস্তে উহাদিগকে আল্লাহ্‌তায়ালার অনস্বীকার্য অস্তিত্বের অনির্বান ও অনির্বায্য আলোক-বলয় রূপে দেখিবে। যে হাত খোদার রসুলকে মারিতে আসিয়াছিল, উহা রসুলের হস্তে স্থাপিত হওয়ায় আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের জ্যোতিতে উহা চিরশোভাময় হইয়া রহিল। পুরুষের জন্য ইসলামে স্বর্ণের ব্যবহার হারাম। সেই জন্য সারাকা ইহা পরিতে চাহে নাই। কিন্তু আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের ইহা মহা নিদর্শন বলিয়া হযরত উমর (রাঃ) তাহাকে ইহা জোর করিয়া পরাইয়াছিলেন।

যখন হযরত রসুল করীম (সাঃ) মদীনার নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন আসলাম গোত্রের বারিদা নামে এক ব্যক্তি, যে পুরস্কারের প্রলোভনে দলবল সহ হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছিল, তাঁহাকে দেখিতে পাইল। তখন তিনি পবিত্র কুরআন তেলাওত করিতেছিলেন। দুশমনগণ নিকটবর্ত্তী হইলে তাঁহাকে দেখিয়া ও তাঁহার মুখে পবিত্র কুরআনের বাণী শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। তাহাদের দুরাভিসন্ধি

সদিচ্ছায় পরিবর্তীত হইল এবং হৃদয় ভক্তিতে অপ্লুত হইয়া গেল। তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিল।

এক হিজরতের পথেই হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে পর পর চারিটি বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। ইহা ছাড়া তাঁহার জীবনে যে কত বিপদ অসিয়াছিল, তাহার সংখ্য নাই। একদা যুদ্ধোপলক্ষে হযরত রসুল করিম (সাঃ) যখন বিচ্ছিন্ন হইয়া এক বাগানে গিয়া গাছের তলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন এক বিদ্বেষী ইহুদী তাঁহাকে তদবস্থায় পাইয়া তাঁহার বক্ষে চাপিয়া বসিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে তরবারী কোষমুক্ত করিয়া উর্ধে উত্তোলিত করিল। হযরত রসুল করীম (সাঃ) জাগিয়া উঠিলেন। ইহুদী তাঁহাকে বলিল, এখন কে আপনাকে রক্ষা করিতে পারে? তিনি নিশ্চিন্ত ভাবে উত্তর দিলেন, আল্লাহ্। এই উত্তরে কি যাদু ছিল, ইহুদীর হাত কাঁপিয়া, তাহার হস্ত হইতে তরবারী খসিয়া পড়িল। হযরত রসুল করীম (সাঃ) ইহুদীকে ঠেলিয়া দিয়া তরবারী কুড়াইয়া লইয়া তাহার দিকে উত্তোলিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে এখন তোমাকে রক্ষা করিবে? ইহুদী ভয়ে ভীত হইয়া বলিল, আপনি। হযরত রসুল করীম (সাঃ) তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, তুমি এখনই দেখিলে কে আমাকে বাঁচাইল? তুমি তাঁহার নাম গ্রহণ কর না কেন? এই বলিয়া তিনি তরবারী নামাইয়া লইলেন। ইহুদী তাঁহার এই মহানুভবতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। সে যাঁহাকে মারিতে আসিল, সে তাঁহাকে মারিতে পারিল না, অথচ তিনি তাহাকে হাতে পাইয়াও প্রতিশোধ লইলেন না। তাঁহার মুখোচ্চারিত আল্লাহ্ নামের তীর ইহুদীর মনের পশুকে মারিয়া ফেলিল এবং তাঁহার ক্ষমা তাঁহাকে অমর জীবনের অভিষেক দিল। ইহুদী ইসলাম কবুল করিল।

যদি হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর জীবনে একটি দুইটি বিপদ আসিত এবং তিনি উহা হইতে উদ্ধার পাইয়া যাইতেন, তাহা হইলে এক অবিশ্বাসী বলিতে পারিত, উহা হঠাৎ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এক দিকে যেমন প্রত্যেক বিপদ আসিবার পূর্বে আল্লাহ্-তায়ালা তাঁহাকে বিপদের স্বরূপ সম্বন্ধে সংবাদ দিয়াছিলেন, তেমনি সেগুলি হইতে তাঁহাকে রক্ষা করার অভয় বাণী পূর্ব হইতে দিয়াছিলেন। তদানুযায়ী তাঁহার জীবনে বিপদরাশী ধারাবাহিকভাবে যত রূপ ধরিয়া আসিয়াছিল, আপন গৃহে পরিবেষ্টিত অবস্থায়, গুহার মধ্যে, মরুভূমির মাঝে, অথবা শত্রুর মুষ্টির তলে, প্রত্যেক অবস্থার তিনি সহজ অথচ অলৌকিকভাবে সম্মানের সহিত রক্ষা পাইয়াছিলেন। কোন ক্ষেত্রে শত্রুর মনে ভীতির উৎপাদন করিয়া, কোথাও শত্রুকে উপহাসস্পদ করিয়া, কোথাও শত্রুকে বিপদ দিয়া এবং কোথাও শত্রুর মনকে বিগলিত ও পরিবর্তীত করিয়া খোদা নিজের নিত্য নূতন মহিমার প্রকাশ দেখাইয়া আপন প্রিয় রসুলকে রক্ষা করিয়াছিলেন। পলাতক প্রাণের ভয়ে পলায়। কিন্তু কোন অবস্থাতেই হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর মনের ত্রিসীমানায় বিন্দুমাত্র ভয়ের ছায়াপাত হয় নাই। সকল অবস্থায় তিনি নির্ভয় এবং আল্লাহ্তায়ালার উপর নির্ভরশীলতার এক অদ্বিতীয় আদর্শ ছিলেন। কাহারও পলায়নের অবস্থা প্রায়ই অন্ধকার ও গ্লানিপূর্ণ হইয়া থাকে। কিন্তু হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর হিজরতের পথকে আল্লাহ্তায়ালা এরূপ জ্যোতিঃ ও গৌরবে পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন যে, ১৪০০ বৎসর অন্তে আজও উহার আলো হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর জীবনী পাঠকারীর হৃদয়কে ঈমানের আলোকে সমুজ্জল করিয়া দেয়।

নবীগণকে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া স্বীয় হেফাযতের নিদর্শন দেখানো আল্লাহ্তায়ালার চিরন্তন

সুন্নত। এ যুগেও আমরা হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর জীবনে এরূপ বহু নিদর্শন দেখিতে পাই। এখানে আমরা একটি ঘটনার উল্লেখ করিব। ঘটনাটি ১৮৬৭ ঈসাব্দে শিয়ালকোটে ঘটে। নিম্নে আমরা ঘটনাটির বিবরণ হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর লিখার অনুবাদ দিলাম।

"এক রাত্রে এক বাড়ীর উপরতলায় আমি শয়ন করি। একই প্রকোষ্ঠে আমার সহিত পনর ষোল ব্যক্তি শয়ন করেন। রাত্রে ছাদের কড়িকাঠে কড়কড় শব্দ হইতেছিল। আমি সকলকে জাগ্রত করিয়া বলিলাম যে, কড়িকাঠের অবস্থা আশঙ্কাজনক বোধ হইতেছে। এখান হইতে বাহির হওয়া কর্তব্য। তাঁহারা বলিলেন, বোধ হয় কোন ইঁদুর হইবে। ভয়ের কোন কারণ নাই। এই বলিয়া তাহারা ঘুমাইয়া পড়িলেন। অল্পক্ষণ পরে আবার ঐ প্রকার শব্দ হইল। তখন আমি আবার তাঁহাদিগকে জাগ্রত করিলাম। কিন্তু তবু তাহারা ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। তৃতীয় বার কড়িকাঠ হইতে শব্দ আসিল। তখন আমি তাহাদিগকে বলপূর্বক উঠাইয়া সকলকে গৃহের বাহির করিয়া দিলাম। সকলে বাহিরে যাওয়ার পর আমিও সেখান হইতে বাহির হইলাম। আমি সিঁড়ির দ্বিতীয় ধাপে পা দিবা মাত্র ছাদটি নীচে পড়িয়া গেল, এবং একতলার ছাদ সহ ভূপতিত হইল। সকলেই রক্ষা পাইল।"

(হায়াতুন নবী, প্রথম জিলদ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৭০ পৃঃ)।

অপূর্ব আল্লাহ্‌তায়ালার রক্ষা ব্যবস্থা। এই ঘটনাটি হইতে মানুষের জন্য নবীর হৃদয়ে যে কতখানি মমতা থাকে, তাহা লক্ষ্য করিবার বস্তু। হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর অপেক্ষায় ছাদটির পতনকে আল্লাহ্‌তায়ালা ঠেকাইয়া রাখিয়া ছিলেন। ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। ইচ্ছা করিলে অবাধ্য মানুষগুলিকে ফেলিয়া তিনি নিজ জীবন বাঁচাইতে পারিতেন। কিন্তু নিজে আগে বাহির না হইয়া, মানব দরদী নবী প্রথমে তাহাদিগকে বলপূর্বক বাহির করিলেন, এবং যতক্ষণ না তাহারা সকলে বাহিরে গেল ও নিরাপদ হইল; ততক্ষণ তিনি স্বয়ং বাহিরে আসিলেন না। এই ঘটনাটির মধ্যে মানবের জন্য তাঁহার মনে যে দরদ অঙ্কুরবৎ ফুটিয়া উঠিয়াছিল, পরবর্তীকালে বিশ্ব-মানবকে মহা বিপৎপাত ও ধ্বংসাবলী হইতে বাঁচাইবার জন্য জগতের বিরুদ্ধাচরণকে মস্তকে বরণ করিয়া দিবারাত্রি তাঁহার বিরামহীন আমল, উপদেশ, বক্তৃতা, লেখা ও দোয়ার মাধ্যমে উহা পূর্ণ রূপ পাইয়াছিল। তিনি স্বয়ং আল্লাহ্‌তায়ালার যে হেফাযত লাভ করিয়াছিলেন, বিশ্ব-মানবও সেই হেফাযত লাভ করুক, তাহার জন্য তিনি অত্যন্ত লালায়িত ছিলেন। তাই তিনি দুনিয়ার অভিশাপ, গালিমন্দ ও বিরুদ্ধাচরণকে উপেক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। সমবেদনায় বিগলিত ভাষায় তিনি তাই তাঁহার অনুগামীগণকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন,

گالیاں سنکے دعا دو دکھ پاکے آرام دو

"গালি শুনিয়া দোয়া দাও এবং দুঃখ পাইয়া আরাম দাও।" হায়! জগতবাসী তাঁহার মর্মবেদনা বুঝে নাই। নিত্য নৈমিত্তিক বিপদাবলী প্রত্যক্ষ করিয়া আজও তাহারা বুঝিতে চাহিতেছে না। কত ভাল হইত যদি তাহারা বুঝিত যে, সারা আকাশ ভাঙিয়া তাহাদের মাথায় পড়িতে বিলম্ব নাই! শিয়ালকোটের দ্বিতলবাসীগণের ন্যায় যদি পার্থিব উন্নতির দ্বিতলে অবস্থিত চেতনাহীন জগদ্বাসী অবাধ্যতা করার পরও তাঁহাকে মানিয়া লইত, তাহা হইলে শিয়ালকোটের দ্বিতলবাসীগণের ন্যায় তাহারাও আজ ধ্বংসের বিপদ হইতে বাঁচিয়া যাইত। সেরূপ হইলে কতই না আনন্দের বিষয় হইত। হে আল্লাহ্! তুমি জগদ্বাসীকে সুমতি দাও।

আরোগ্যকারী

আল্লাহ্‌তায়ালার এক নাম شافى (শাফী) অর্থাৎ আরোগ্যকারী। যদিও ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ঔষধে সাধারণতঃ আমাদের ব্যাধি সারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌তায়ালাই আরোগ্যকারী। ঔষধ তাঁহারই সৃষ্ট এবং তাঁহারই আদেশে ঔষধ ক্রিয়া করে। কিন্তু ঔষধের সৃষ্টির পিছনে তাঁহার আরোগ্যকারী হাত এবং ঔষধের ক্রিয়ার পিছনে তাঁহার আদেশ প্রকৃতির মধ্যে এরূপ প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে যে, আমরা উহা অনুভব করি না। উহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যখন ডাক্তার কবিরাজ ও ঔষধ ব্যবস্থা সব ফেল হইয়া যায় এবং দোয়া ও উত্তরে আরোগ্য সংবাদ আসে এবং পরিণামে রোগী আরোগ্য হইয়া যায়। এ সম্বন্ধে আমরা কতকগুলি ঘটনা বর্ণনা করিব।

হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর যুগে তেমন ঔষধ পত্রের ব্যবস্থা ছিল না, সেইজন্য তাঁহার যুগে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের দৃষ্টান্ত মিলা কঠিন। তবু দুই একটি রোগারোগ্যের দৃষ্টান্ত দিব।

খয়বরের যুদ্ধের সময় হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিলেন, আমি যাহার হস্তে পতাকা দিব, সেই যুদ্ধ জয় করিবে। হযরত উমর (রাঃ) বলিয়াছেন যে, যখন পতাকা দিবার সময় আসিল তখন আমি মাথা উঁচু করিয়া দেখিতে লাগিলাম এবং ভাবিলাম যে হযরত রসুল করীম (সাঃ) পতাকা আমাকেই দিবেন। এমন সময়ে হযরত আলি (রাঃ) আসিলেন। তখন তিনি চক্ষের যন্ত্রনায় কাতর। হযরত রসুল করীম (সাঃ) তাঁহার চক্ষে নিজ মুখের থুতু লাগাইয়া দিলেন এবং পলকে তাহার চক্ষু আরোগ্য হইয়া গেল এবং তিনি তাঁহার হস্তে পতাকা তুলিয়া দিলেন। এ ক্ষেত্রে তাহার মুখের থুতু দোয়ার কল্যাণে কাজ করিল।

খয়বরের যুদ্ধের পর যয়নাব নাম্নী এক ইহুদী রমণী হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে দাওত করিয়া বিষ মাখান গোস্ত খাইতে দেয়। তিনি উহা খাইয়া বুঝিলেন যে উহাতে বিষ আছে। ইহুদী রমণীর উদ্দেশ্য ছিল তাঁহাকে পরীক্ষা করা। যদি তিনি নবী হন তাহা হইলে তিনি পূর্ব হইতে জানিতে পারিবেন এবং উহা খাইবেন না এবং যদি মিথ্যাবাদী হন, তাহা হইলে উহা খাইয়া মারা যাইবেন। যখন তাঁহার মধ্যে বিষ ক্রিয়া দেখা দিল, তখন ইহুদী রমণী এই কথা প্রকাশ করিল। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার অপার হিকমতে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে বিষের কথা পূর্ব হইতে জানিতে দিলেন না। পূর্ব হইতে বিপদ জানাইয়া দিয়াই যে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার নবীকে বাঁচাইয়া লয়েন, তাহা নহে বরং জীবন ও মৃত্যু যে তাঁহারই হুকুমের অধীন, তাহা দেখাইবার জন্যই আল্লাহ্‌তায়ালা পূর্ব হইতে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে বিপদের সতর্কবাণী দেন নাই। তাঁহার সঙ্গে এক সাহাবীও বিষযুক্ত গোস্ত ভক্ষণ করিয়া অবিলম্বে মারা যান। কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট দোয়া করিয়া আরোগ্য লাভ করিলেন এবং বাঁচিয়া গেলেন। ইহুদী রমণী এবং সকলে ইহা দেখিয়া বুঝিল যে তিনি সত্য রসুল, তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার হেফাযতে আছেন এবং আপন রসুলের প্রতি তাঁহার ওয়াদা সত্য। তিনিই জীবন এবং মরণ দানের অধিকারী।

সওর গিরি গুহায় হযরত রসুল করীম (সাঃ) দুই দিন অবস্থান করেন। ইহার মধ্যে একদিন যখন হযরত রসুল করীম (সাঃ) ঘুমাইতেছিলেন, তখন গুহার ভিতরের গর্ত হইতে একটি বিষাক্ত সাপ পাহারারত হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর পায়ে কামড়াইয়া দেয়। হযরত রসুল করীম (সাঃ) যখন জাগিয়া এ বিষয় জানিতে পারিলেন, তখন সেখানে কোন ঔষধ পত্রের ব্যবস্থা ছিল না। তাঁহার দোয়া দ্বারাই তিনি আরোগ্য লাভ করেন।

বর্তমান যুগ চিকিৎসা বিদ্যার অভূতপূর্ব উন্নতির যুগ। এখন দোয়ার ফলে রোগারোগ্যের সম্বন্ধে আমি হযরত মসিহ্‌ মওউদ (আঃ)-এর জীবনের একটি ঘটনার উল্লেখ করিব।

আবদুল করীম নামে একটি বালক কাদিয়ানে পড়িত। তাহার বাড়ী ছিল দাক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদে। একবার তাহাকে পাগলা কুকুরে কামড়ায়। চিকিৎসার জন্য তাহাকে কসৌলী পাঠান হয়। সে আরোগ্য লাভ করিয়া ফিরিয়া আসে। কিছু দিন পরে তাহার জলাতঙ্ক রোগ দেখা দিল। কসৌলীতে তার দিয়া চিকিৎসার উপদেশ চাওয়া হইল। উত্তর আসিল, Sorry nothing can be done for Abdul Karim. দুঃখের বিষয়, আবদুল করীমের জন্য করিবার কিছুই নাই। বস্তুতঃ পাগলা কুকুর কামড়াইবার পর আরোগ্য লাভ করিয়া পরে জলাতঙ্ক রোগ দেখা দিলে আজও উহার চিকিৎসা নাই। রোগীর মৃত্যু অবধারিত। যখন আবদুল কারীমের সম্বন্ধে নৈরাশ্যজনক উত্তর আসিল, তখন শিক্ষার উদ্দেশ্যে দুরাগত এই বালকের জন্য হযরত মসিহ্‌ মওউদ (আঃ)-এর অন্তরে মমতা জাগিয়া উঠিল। তিনি তাহার আরোগ্যের জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট দোয়া করিলেন। ফলে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার দোয়া কবুল করিলেন এবং আবদুল করীমকে আরোগ্য দিলেন। এই সংবাদ যখন কসৌলীতে জানান হইল, তখন সেখানকার ডাক্তার বিস্ময় প্রকাশ করে। অদ্যাবধি এই শ্রেণীর রোগী একটিও বাঁচে নাই। সুতরাং বুঝা গেল যে চিকিৎসা শাস্ত্রকে ছাড়াইয়া উর্ধে এক মহান হাকিম আছেন, যাঁহার হস্তে বিনা ঔষধেও আরোগ্য দিবার অধিকার রহিয়াছে।

হযরত মসিহ্‌ মওউদ (আঃ)-এর জীবনে দোয়ার দ্বারা রোগারোগ্যের বহু ঘটনা আছে, কিন্তু উপরের ঘটনাটি নযীরবিহীন।

হযরত খলিফাতুল মসিহ্‌ সানী (রাঃ)-এর দোয়াতেও বহু রোগী আরোগ্য হইয়াছে। এখানে আমার সময়কার একটি আশ্চর্য ঘটনা বর্ণনা করিব।

১৯৪২ ঈসাব্দে বগুড়ায় জনাব মৌলবী মোবারক আলী সাহেব, অবিভক্ত বাংলার ভূতপূর্ব প্রাদেশিক আমীর, খুবই অসুস্থ হইয়া পড়েন। সিভিল সার্জন তাঁহার চিকিৎসা করিতে ছিলেন। একদিন তিনি রোগীর অবস্থা দেখিয়া জবাব দিয়া বসিলেন। তিনি জানাইলেন যে রোগীর হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, যকৃত, রক্ত, মস্তিষ্ক কোনটিই কাজ করিতেছে না। সুতরাং তিনি আর অল্প সময়ের মেহমান। মৌলবী যিল্লুর রহমান সাহেব মরহুম কলিকাতা হইতে তার পাইয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া তাঁহাকে এই অবস্থায় পাইলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে হযরত খলিফাতুল মসিহ্‌ সানী (রাঃ)-এর নিকট দোয়ার জন্য তার করিলেন। শঙ্কায় রাত্রি কাটিয়া গেল। প্রভাতে মৌলবী মোবারক আলি সাহেবের অবস্থা কিছু ভাল দেখা গেল। সিভিল সার্জনকে ডাক দেওয়া হইল। রুগী এখনও বাঁচিয়া আছেন শুনিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। তখন তিনি আন্দাজ করিতে পারিলেন না যে, তাহার জন্য আরও বিস্ময় অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে। যখন তিনি আসিয়া রোগীকে পরীক্ষা করিলেন, তখন তিনি দেখিলেন যে তাঁহার দেহের পূর্ব দিনের সকল বিকল যন্ত্রগুলি কাজ করিতেছে। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, পূর্ব দিন তিনি দেখিয়া যাওয়ার পর রাত্রে কি অন্য কোন ডাক্তার আনা হইয়াছিল এবং কি ঔষধ খাওয়ানো হইয়াছিল। তাঁহাকে জানানো হইলে যে কোন ডাক্তারও আসে নাই এবং কোন ঔষধও খাওয়ানো হয় নাই তিনি মহা বিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, এ পরিবর্তন কিরূপে সম্ভব হইল? মৃত কি ভাবে জীবিত হইয়া উঠিল! তখন মৌলবী যিল্লুর রহমান সাহেব মরহুম জানাই-

লেন যে আমাদের খলিফার নিকট দোয়ার জন্য তার দেওয়া হইয়াছিল। উহারই ফলে এই পরিবর্তন। ইহার পর অল্প দিনেই তিনি আরোগ্য হইয়া উঠিলেন। আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহে তিনি আজও জীবিত আছেন। তিনি আমাদের জামাতের অতি প্রাচীন এক বুযুর্গ। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহাকে আরও বহু দিন জীবিত রাখুন।

আমাদের জামাতে এই প্রকারে দোয়ার ফলে ভাল হওয়ার ভূরী ভূরী নিদর্শন আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে এবং নিত্য দর্শন করিতেছি।

এ যাবৎ আমরা দৈহিক ব্যাধির আরোগ্যের কথাই বলিয়া আসিলাম। কিন্তু নবীগণ দৈহিক ব্যাধির চিকিৎসার জন্য আসেন না। আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়া জনগনকে তাহাদের অধিকতর গুরুতর ব্যাধির চিকিৎসার জন্য দৃষ্টি আকর্ষন করিতে, তাঁহারা ও তাঁহাদের খলিফাগণ ডাক্তারের দ্বারা ঘোষিত দুরারোগ্য রোগীকে দোয়ার দ্বারা আরোগ্য করেন। নবীগণের প্রকৃত আগমনের উদ্দেশ্য মানবজাতির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাধির চিকিৎসা করা, যাহার ব্যবস্থা দুনিয়ার কোন ডাক্তার, দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিকের নিকট নাই। তাঁহারা আল্লাহ্‌তায়ালার আয়াত, নিদর্শন ও বিরামহীন দোয়ার দ্বারা মানবের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাধি আরোগ্য করেন। তাঁহাদের স্পর্শে মুহূর্তে মহাপাপীর মনের ভাব পরিবর্তীত হইয়া সে সাধু হইয়া যায়। নবীদের জীবনী ইহার দৃষ্টান্তে ভরা। এখানে আমি এ সম্বন্ধে হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর জীবনের একটি মাত্র ঘটনা উল্লেখ করিব।

হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর এক বন্ধু ছিল। সে যদিও মাতাল ছিল, কিন্তু হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-কে সে খুব ভক্তি করিত। তাহার ভক্তি দেখিয়া ঐ সাহাবী তাহাকে হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর হস্তে বেয়াত করিতে বলেন। ইহার উত্তরে সে জানায় যে হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর হস্তে বেয়াত করিতে গেলে তিনি প্রথমেই বলিবেন, মদ খাইও না। আমি পাঁড় মাতাল, আমার মদ পরিত্যাগ করিবার ক্ষমতা নাই। ঐ সাহাবী একদিন এই কথা হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর নিকট বর্ণনা করিলে, তিনি অত্যন্ত জোশের সহিত বলিলেন, "তাহাকে আমার নিকট লইয়া আইস। তাহাকে আমার হস্তে বেয়াত করিতে বল। আমি মদ সম্বন্ধে তাহাকে কিছুই বলিব না। আমার হাতে যাহারা হাত রাখিবে তাহারা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সকল ব্যাধি হইতে মুক্তি লাভ করিবে। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে এই জন্যই পাঠাইয়াছেন। আমার হস্তে বেয়াত করিবার পর, যদি তাহার মদের অভ্যাস না যায়, তবে আমার দাবীই মিথ্যা।" ঐ সাহাবী হৃষ্টচিত্ত হইয়া বন্ধুকে এই কথা জানাইলেন এবং তাহাকে লইয়া আসিয়া বেয়াত করাইলেন। যখন বন্ধুটি বেয়াত করিয়া গৃহে ফিরিয়া গেল, তখন সে মদ্যপান সম্বন্ধে চিন্তাযুক্ত হইয়া পড়িল। মদ্য পান করিবার সময় হইল। এখন সে কি করে। তাহার মনে মহা দ্বন্দ লাগিয়া গিয়াছে। যে হাত দিয়া সে নবীর হাত স্পর্শ করিয়া আসিয়াছে, সে হাতে কিভাবে মদ্যের পেয়ালা উঠাইবে। যে মুখ দিয়া সে বেয়াতের কলেমা পাঠ করিয়া তওবা করিয়া আসিয়াছে, সেই মুখ দিয়া কি ভাবে সে মদ্যপান করিবে। এইরূপ নানা চিন্তা করিতে করিতে তাহার প্রথম বারের মদ খাওয়ার সময় পার হইয়া গেল। দ্বিতীয়বারও এই ভাবে কাটিয়া গেল। প্রথম দিন বিনা মদে কাটিল, দ্বিতীয়, তৃতীয় দিনও কাটিল। মদের পেয়ালা আর তাহার হাতে উঠিল না। চিরদিনের জন্য তাহার মদ্য পানের অভ্যাস চলিয়া গেল।

যাহারা নবীর হাতে হাত রাখে, তাহারা প্রকৃত পক্ষে খোদার হাতে হাত রাখে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন— (অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

আন্‌সারুল্লাহ্‌র দায়িত্ব ও কর্তব্য

—মকবুল আহমদ খান

১। "আন্‌সারুল্লাহ্‌" কথাটার শাব্দিক অর্থ আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী দল। আল্লাহ্‌তা'লার "সাহায্যকারী" বলতে আমরা কি বুঝি? আল্লাহ্‌ কি কাহারও সাহায্যের মুখাপেক্ষী বা মোহ্‌তাজ? তা নয়। যাহারা আল্লাহ্‌তা'লার ইচ্ছাকে পৃথিবীর বুকে কার্যকারীভাবে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেন এবং ইহাকেই জীবনের চরম লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট করে সেই অনুযায়ী কাজ করেন। তাহারাই আনসারুল্লাহ উপাধি লাভ করার সম্মান প্রাপ্ত হন। খোদার পথে উৎসর্গীকৃত মানুষের জন্য ইহা একটি সম্মানিত পদবী। চল্লিশের ও উর্দ্ধ বয়স্ক আহমদীগণকে "আনসারুল্লাহ্‌" পদবীতে ভূষিত করার মাঝে হযরত খালিফ সানি মোসলেহ্‌ মওউদ (রাজিঃ) আল্লাহ্‌র এই মহৎ উদ্দেশ্যই ছিল যে তারা যেন দুনিয়ার মোহ-মাৎসর্য্য, সুখ-সম্ভোগ ও লোভ-লালসার বেড়াজাল হতে নিজকে মুক্ত করে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছাকে নিজের জীবনে পূর্ণতমভাবে বরণ করে নেন এবং দুনিয়ার বুকে সেই এলাহি বাসনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন।

২। সেই এলাহি বাসনা কি? বর্তমানের অধর্ম ও ভ্রান্ত ধর্মের কবল হ'তে মানুষকে মুক্তি দিয়া তাহাদের মনে সত্য ও পূর্ণ ধর্ম ইসলামকে স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত করাই আল্লাহ্‌তা'লার প্রধান ইচ্ছা। এ যুগে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-কে পাঠায়ে খোদাতা'লা তাহার মাধ্যমে এই ইচ্ছাই প্রকাশ করেছেন। রসূলে মকবুল (সাঃ)-এর মারফৎ সত্য ও পূর্ণতম ধর্ম ইসলামকে পৃথিবীর বুকে পাঠায়ে আল্লাহ্‌তা'লা ওয়াদা করেছিলেন,

هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله -

অর্থাৎ মহিমান্বিত খোদা সত্য ধর্ম ও সঠিক পথ সহ নবী করীমকে দুনিয়াতে পাঠায়েছেন, যাতে

(আল্লাহতায়ালার অস্তিত্বের অবশিষ্ট্য)

ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يدالله فوق ايديهم -

"নিশ্চয়, যাহারা তোমার হস্তে বেয়াত করে, তাহারা সুনিশ্চিত আল্লাহ্‌র নিকট বেয়াত করে। আল্লাহ্‌র হাত তাহাদিগের হাতের উপর রহিয়াছে।"

(সূরা ফতেহ, ১ম রুকু)।

যাহারা নবীর হাতে হাত রাখিয়া আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদের বন্ধু হইয়া যান এবং তাহাদিগকে তিনি স্বয়ং শুদ্ধ করিয়া লয়েন। আল্লাহ্‌তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলিয়াছেন—

الله ولى الذين امنوا يخرجهم من الظلمت الى النور ط

"যাহারা ঈমান আনে, আল্লাহ্‌ তাহাদের বন্ধু হন; তিনি তাহাদিগকে সকল প্রকার অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া আলোকে আনেন।"

(সূরা বকর, ৩৪শ রুকু)।

যাহারা আন্তরিকতা লইয়া নবীর জামাতে প্রবেশ করিয়া থাকে, আল্লাহ্‌তায়ালা নিজ বাক্য অনুযায়ী তাহাদিগের মন ও আত্মার সকল ব্যাধি আরোগ্য করিয়া দেন।

বহু ব্যাধিতে জর্জরিত ও ভারাক্রান্ত হে মানব জাতি! আল্লাহ্‌তায়ালার তরফ হইতে তোমাদিগকে নীরোগ করিবার জন্য তাঁহার আধ্যাত্মিক ডাক্তার হযরত মসিহ্‌ মওউদ (আঃ) আসিয়াছেন। অমর জীবনানন্দ লাভের জন্য তাঁহার দিকে ধাবিত হও। (চলবে)

*

অন্যান্য ধর্মের উপর এই ধর্ম (ইসলাম) প্রধান্য লাভ করে। সেই ওয়াদা খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে পূর্ণ হয়েছিল। ইসলাম সমসাময়িক ধর্ম সমূহের উপরে নিজের স্থান করে নিয়েছিল। জ্ঞানে গুণে, কর্মে ও মহিমায় ইসলামের অনুসারীরা পৃথিবী ব্যাপী প্রাধান্য স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু ইসলামের সেই সফলতার স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেনি। ইসলামের সেই বিজয়ের দিন ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে গেল। কেননা, মোসলমানগণ ভোগ বিলাসের স্রোতে গা ভাসায়ে দিয়ে ধর্ম প্রবনতা হতে দূরে খসে পড়লেন এবং বহিঃ শত্রুর কবলে পড়ে হীনবল হয়ে গেলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তার মনোনীত ধর্ম ইসলামকে দীর্ঘকাল অসহায় ভাবে ছেড়ে দিতে পারেন না। তাই তিনি এ যুগে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর উম্মতের মধ্য হতে হযরত মসিহে মওউদ ইমাম মাহদীকে (আঃ) ইসলামের পূর্ণ বিজয়ের জন্য প্রেরণ করে আবার ঘোষণা করলেন,

هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله -

৩। ইসলামের এই পূর্ণ বিজয়ের কাজ সম্পন্ন করা এবং অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করাই মসীহে মওউদ (আঃ) প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া জামাতের নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। এই কাজ সুচারুরূপে সম্পাদন করবার জন্য আংফালুল আহ্মদীয়া, খোদ্দামুল আহ্মদীয়া, আন্সারুল্লাহ্ ও লাজনা এমাউল্লাহ্ নামে জমাআতে চারিটি কর্ম্মী সংগঠন রহিয়াছে। ইহারা ধর্ম কাজে ও ধর্ম প্রচারের কাজে অন্যের পরিপূরক অনুপূরক।

৪। বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়ার দরুণ একাজে আনসারুল্লাহ্র দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সবচেয়ে অধিক। কেননা তাদের আখ্লাক্ ও চাল-চলন, তাদের ধর্ম ভাব ও ধর্ম ভিরুতা, তাহাদের কর্ম প্রেরণা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা বয়োকনিষ্ঠদের উপর বিশেষ রেখাপাত করে। এজন্য ধর্ম পালনে ও সৎকর্ম শীলতায় এবং আনুগত্য ও শৃঙ্খলা রক্ষায় তাহাদিগকে অন্যান্যদের নিকট আদর্শ স্থানীয় হতে হবে।

৫। খোদাতা'লা বর্তমানে আহমদীয়া জামাতের উপর ইসলামের পুর্নজাগরণের যে বিরাট ও মহান কর্তব্য অর্পণ করেছেন, তা উপলব্ধি করার দায়িত্ব যদিও সাধারণভাবে সকল আহমদীরই, তথাপি একথা নিশ্চয় নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এর সর্ব্বোচ্চ দায়িত্ব আনসারুল্লাহ্র। কেননা বয়স, জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, উপলব্দি, আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতায় তারা যুবক ও তরুণদের উর্দ্ধে স্থান পাওয়ার যোগ্যতা রাখা স্বাভাবিক।

৬। খোদা ও রসুলের অর্পিত এই মহান কর্ত্তব্য সম্পাদন করতে হলে, ইসলামের বিজয় অভিযানে সিপাহ্সালার বনতে হলে আনসারুল্লাহ্কে তথা আহমদীয়া জমাতের প্রত্যেককে রসুলে করীম (সাঃ)-এর সাহাবীদের মত ধর্ম সর্বস্ব ব্যক্তিতে পরিণত হতে হবে। কেননা আত্মত্যাগ, ধর্মানুরাগ ও আদেশ পালনের আগ্রহই সাহাবীগণকে বহুগুণ শত্রুর উপর বিজয় প্রদান করেছিল। এই অপূর্ব আত্মত্যাগের কাহিনী শুধু ইসলামের ইতিহাসেই নয়, সারা বিশ্বের ইতিহাসে আজও অমর হয়ে আছে। প্রাথমিক যুগের মুসলিমের বীরত্ব ও আত্মত্যাগ, ধর্ম সর্বস্বতা ও আধ্যাত্মিকতা, মানব ইতিহাসের আর কোথাও খোজে পাওয়া যাবে না। তাই তারা যেদিকে যেতেন; বিজয়ের নিশান উড়াতেন।

৭। এ যুগেও সত্য ধর্মের পুনর্বিজয়ে, স্থায়ী ও পূর্ণ বিজয়ে আহ্মদী ভ্রাতৃবৃন্দকে সাহাবাগণের পদাঙ্কই অনুসরণ করতে হবে। ইসলামের বিজয় অভিযানে এটাই একমাত্র পরীক্ষিত পথ। সাহাবাদের অনুরূপ একদল যারা পরবর্তীকালে ধরাধামে আগমণ করবেন বলে কোরআন শরীফে উল্লেখ রয়েছে,

সেই দল আমরাই; যারা ধর্মকর্মে জীবন সর্বস্ব পণ করেছি। কোরআন শরীফে উল্লেখ আছে—

অর্থাৎ এই সাহাবাদের অনেকদিন পর আবার তাহাদেরই অনুরূপ আর একদল সৃষ্টি করব। আহ্‌মদীয়া জমাত নিজেকে সাহাবাদের স্থলবর্তী পরবর্তী দলবলে বিশ্বাস করে থাকে। এমতাবস্থায় আন্‌সারুল্লার প্রধান কর্তব্য তাহাদের জীবনে সাহাবাবের আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত করা। চরিত্রের মাধুর্য্য সংকল্পের দৃঢ়তায়, আত্মত্যাগের মহিমায় ও খোদা ভীরুতায়, আনসারুল্লাহ সাহাবাদের মত হলে তবেই আমরা ইসলামের বিজয় অভিযানে সফল হব। আনসারুল্লাহ্‌র জীবন অন্যান্যদের জন্য আদর্শ স্থানীয় হলে, খোদ্দাম, আৎফাল ও লাজনা এমাউল্লা সকলেই পূর্ণোদ্যমে এ জয় যাত্রায় সাথী হবে।

৮। প্রতিষ্ঠানগতভাবে "আনসারুল্লা" চল্লিশ বৎসর ও তদূর্দ্ধ বয়স্ক লোকদের নিয়া গঠিত এই বয়সে মানুষ একদিকে যেমন বিভিন্ন বিষয়ে পরিপক্কতা অর্জন করে স্থায়ী দোষগুণের অধিকারী হয়, অন্যদিকে সে ধারণা করতে থাকে যে এখন সে ক্রমশঃ জীবনের শেষ পরিণতিরদিকে অগ্রসর হচ্ছে। তাই তার মনে ধর্মভাব প্রবল হয়। ভোগবিলাসের ঢেউ তার মনে স্তিমিত হয়ে আসে। মৃত্যুর নিনাদ তার মনকে আলোড়িত করতে থাকে। পরপারের হিসাব নিকাশের চিন্তায় সে অধিক আগ্রহী হয়। পূর্ববর্তী জীবনের ভুলত্রুটি ও অপরাধগুলি তখন সে শুধরাতে ব্যস্ত হয়। বয়সের স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে, সে ধর্মভীরুতা, পবিত্রতা ও সৎকর্মে অধিক মনোযোগী হয়। তখন আল্লাহ্‌র মর্জি ও ইচ্ছার রূপায়নে সে জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়। আল্লাহ্‌তা'লার ইচ্ছার রূপায়ন তাদের একমাত্রলক্ষ্য হওয়া উচিৎ, এই ধারনাতেই ৪০ বৎসর ও তদূর্দ্ধ বয়স্ক আহ্‌মদীগনকে "আনসারুল্লাহ্" পদবী দান করা হয়েছে। যাতে তারা সাহাবা কেরামের মত নিজেরা তাকওয়া, পরহেজগারী, দুনিয়া বিমুখতা, আত্মত্যাগ, ও এবাদৎ বন্দেগীতে জীবনের এই দিনগুলি কাটায়ে দেন।

৯। ধর্মপালন ও ধর্মপ্রচারকে আল্লাহ্‌র মান্‌সা মনে করে, দুনিয়ার সর্ব্বপ্রকার দুঃখ-কষ্ট বরদাশ্‌ত করবার জন্য তাহাদের সর্বদা তৈরী থাকতে হবে। "সাহাবারা" ছিলেন "আনসারুল্লাহ্।" "তাবেরীনরা" ছিলেন আনসারুল্লাহ্। ধর্মের ডাকে তারা মুহুর্তের মধ্যে সারা দিয়েছেন, প্রাণ দিয়েছেন। তাই আল্লাহ্‌তা'য়ালা তাদের জন্য দুনিয়াতেই শুভ সংবাদ দিয়ে তাদিকে বেহেস্তের অধিবাসী বলে বর্ণনা দিয়েছেন।

১০। আনসারুল্লাহ্‌কে "এই শুভ-সংবাদ" গ্রহণের জন্য আল্লাহ্‌র হুযুরে কাজ করে যেতে হবে যাতে তিনি এই দুনিয়ায়ই বুঝতে পারেন, আখেরাতে তিনি কোন্ ঠিকানায় পৌঁছাবেন। এই শুভ সংবাদ পাওয়ার বিরামহীন প্রচেষ্টা যদি তাঁর মাঝে না থাকে, তবে বুঝতে হবে, তিনি আনসারের অকৃত দরজায় পৌঁছতে পারেন নি। আখেরাতের পথিক হয়ে যদি ঠিকানা সম্বন্ধে অন্ধ থাকেন, তা হলে পরজগতে যাওয়ার পূর্বেই আপনার মন অস্থির ও অশান্ত হয়ে উঠবে? ক্রন্দনের সুরে বলতে থাকবেন, "হায়, কোথায় চল্লাম। কি হবে?" আর যদি এ জগতেই নিজের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে মৃত্যুর পরেই আমি আল্লাহ্‌তালার কোলে স্থান গ্রহণ করব, কেননা তিনি আমার উপর সন্তুষ্ট আছেন, তাহলে আপনি হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করতে পারবেন এবং আনসারুল্লাহ্ নাম তখনই সার্থকতা লাভ করবে।

১১। ব্যক্তিগতভাবে সকলের মধ্যে এই গুন গুলি পূর্ণতা লাভ করতে পারে না বিধায়, প্রত্যেক আনসারুল্লাহ্‌কে "আনসারুল্লাহ্" প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলক ভাবে যোগ দিতে হয়। যাতে পারস্পরিক মেলামেশার মাধ্যমে কমজুরীগুলি দূরীভূত হয়ে যায়

ও ধর্মভাব প্রাধান্য লাভ করে। এই প্রতিষ্ঠান নিজের ঈমান ও আমলের হেফাজত করবে। কথায় বলে "সঙ্গগুনে লোহও জলে ভাসে।"

১২। আনসারুল্লাহ্‌কে কর্মী হতে হবে। কেননা যে বিরাট আশা-আকাঙ্খা আমাদের জমাআতের রয়েছে বিশ্বে ইসলামের বিজয়ের যে ডাকে আমরা আল্লাহ্‌র পথে সাড়া দিয়েছি, কাজ ও কর্মতৎপরতা ব্যতীত সে আশা পূরণ হতে পারে না। তাই শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত আমাদিগকে কর্ম চঞ্চল থাকতে হবে। "মো'মিন সুস্ত নেহি হোতা। ওহ্ হার ওয়াক্ত চুস্ত রহতা হ্যায়।" পরস্পরের সহযোগীতায় এই কর্ম-প্রেরণা জারী থাকে।

১৩। হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি (রা:) ১৯৪৩ ইং ২২শে অক্টোবর বলেছিলেন।

(ক) অধিক বার্দ্ধক্য ও রোগ-শোকের কারণে যে ব্যক্তি জামাতের কোন কাজ করতে পারে না, সেও যেন দোয়া দ্বারা জামাআতের সফলতা কামনা করতঃ জমাআতি কাজে অংশ নেয়।

(খ) প্রতিদিন অন্ততঃ অর্ধ ঘন্টা সময় জমাতের কাজে ব্যয় করা প্রত্যেক আনসারুল্লাহ্‌র কর্তব্য।

(গ) প্রত্যেক আন্‌সারুল্লাহ্‌র দায়িত্ব তিনি তার সন্তানাদির ধর্ম-শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আহমদীয়াত অর্থাৎ সহীহ্ ইসলাম সম্বন্ধে তা'দিকে শিক্ষিত করে তোলা এবং তাদের মধ্যে ধর্মভাব উজ্জিবীত করা প্রত্যেক আনসারের কর্তব্য। কেননা আজকের শিশু আগামীকাল জমাতের কর্ণধার ও কর্মী হবে। তাদের ধর্মশিক্ষায় অবহেলা করা জমাতকে হত্যা করার ন্যায়।

১৫। (ক) এতদ্ব্যতীত খলিফা এবং তাহার নিয়োজিত অফিসারগণের আদেশ উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন ;

(খ) কেন্দ্রীয় ও অন্যান্য মজলিশে আন্‌সারুল্লাহ্‌র সভাপতিগণের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ;

(গ) প্রতিষ্ঠানের নির্দ্ধারিত চাঁদা প্রদান,

(ঘ) আনসারুল্লাহ্‌র মজলিশের বিভিন্ন কর্ম সূচীতে অংশ গ্রহণ এবং প্রোগ্রাম মোতাবেক কাজ করা ;

(ঙ) বিনয়, নম্রতা, পবিত্র জীবন যাপন ও চারিত্রিক উৎকর্ষ প্রদর্শন এবং সর্বোপরি,

(চ) নিজের দোষ ত্রুটি ও কমজুরীগুলির সংশোধন ইত্যাদি প্রত্যেক আনসারুল্লাহ্‌র কর্ত্তব্যের অন্তর্গত। মোটকথা ধর্মের মহিমা কীর্ত্তনেই জীবনের সফলতা, আল্লাহ্‌কে পাওয়াই জীবনের সফল পরিণত এই উপলব্ধিই আন্‌সারুল্লাহ্‌র আসল মূলধন। অতএব চলুন আমরা আমাদের প্রতিজ্ঞাকে স্মরণ করে কর্মে ঝাপিয়ে পড়ি। আমাদের প্রতিজ্ঞা হল—

میں اقرار کرتا ہوں کہ اسلام اور احمدیت کی مضبوطی اور اشاعت او ر نظام خلافت کی حفاظت کیلئے انشاء اللہ تعالیٰ اخر دم تک جدو جہد کرتا رہوں گا - اور اس کیلئے بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنے کیلئے ہمیشہ تیار رہوں گا - نیز میں اپنی اولاد کو بھی ہمیشہ خلافت سے وابستہ رہنے کی تلقین کرتا رہوں گا -|

★

ধর্ম ও অধর্ম

—মোহাম্মদ আবুল কাসেম

আল্লাহ্‌তালার মহান ইচ্ছা এবং আদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত গতিশীল জীবনের আনন্দময় ও স্বভাব সুলভ সুন্দর স্বাভাবিক অবস্থা হইল ধর্ম। আর ইহার বিপরীত আপাতঃ মধুর এবং কৃত্রিমতা মিশ্রিত নৈরাশ্যজনক অবস্থার নাম হইল অধর্ম। আল্লাহ্‌-তা'লা তাঁহার মহান সৃষ্টিকে প্রধানতঃ দুই পর্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন। একটি বিকশিত বাহ্যিক অবস্থা, ভৌতিক জগত। অপরটি গুণগত অদৃশ্য আভ্যন্তরীন অবস্থা আধ্যাত্মীক জগত। আল্লাহ্‌তালা উভয় অবস্থার মধ্যে পরস্পরের অনুপূরক এবং বিপরীত মুখী গুনের সমাবেশ রাখিয়াছেন। অপরদিকে আল্লাহ্‌তা'লা জড় দেহে আত্মার সমন্বয় সাধন করিয়া জড় এবং আধ্যাত্মিক বিধানে যাজা ও সাজার ব্যবস্থা রাখিয়া জড় এবং আধ্যাত্মিক জগৎকে সমান্তরালভাবে ক্রম উন্নতির পথে কল্যাণের দিকে পরিচালিত করিতেছেন। আধ্যাত্মিক জগতের প্রতিচ্ছায়া হইল এই দুনিয়া।

আল্লাহ্‌তালা অনন্ত পথের যাত্রী আদম সন্তানের যাত্রা পরলোকের প্রস্তুতির স্তর দুনিয়ার জীবনের কর্মক্ষেত্রে তাঁহার আদেশ ও নিষেধ অর্থাৎ ধর্ম ও অধর্মের পরস্পর বিপরীতমুখী সুক্ষ্ম প্রভাব, নৈতিক জীবনের ব্যাপক প্রতিক্রিয়া এবং মৃত্যুর পর পারে অবস্থিত বিস্তীর্ণ পারলৌকিক জীবনে ইহজীবনের ন্যায় অন্যায় কর্ম সমূহের পূর্ণ প্রতিফল ভোগের সুখ ও দুঃখজনক অবস্থা অনুধাবনের উদ্দেশ্যে সকলের পরিচিত দিবা ভাগকে ধর্ম এবং দিবসের অবশানে সমাগত অন্ধ-কারাচ্ছন্ন বিপদ সংকুল অবস্থা রাত্রিকে অধর্মরূপে অভিহিত করিয়াছেন।

বিশাল সৃষ্টি জগত মহান স্রষ্টার সক্রিয় আদেশ এবং ইচ্ছার প্রভাবে প্রাকৃতিক এবং আধ্যাত্মিক বিধানে নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত হইতেছে। স্রষ্টা প্রয়োজন এবং চাহিদার উর্দ্ধে থাকিয়া সকলের প্রয়োজন পূরণ করিতেছেন। সৃষ্টি জগত স্রষ্টার মহান ইচ্ছা এবং উদ্দেশ্য পূরণ করিয়া লক্ষ্য পথে অগ্রগামী হইতেছে। সূর্যের উদয় ও অস্তের ফলে জ্যোতির্ময় দিবস এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রিও সৃষ্টি হইয়া থাকে এবং সৃষ্টি জগতের উপর আলো এবং আধারের গভীর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইয়া থাকে। সূর্যকে যে উদ্দেশ্যে সৃজন করা হইয়াছে সূর্য যথা নিয়মে তাহাই প্রতিপালন করিয়া চলিয়াছে। সূর্য সৃষ্টির কল্যাণে মহা প্রতাপে আল্লার ইচ্ছায় জ্যোতি, তেজ, উত্তাপ ও শক্তি বিকিরণ করিয়া লক্ষ্য পথে অগ্রগামী হইতেছে। অপরদিকে সূর্যের পরিজন রূপগ্রহ, উপগ্রহ সমূহ এবং তনমধ্যস্থ যাবতীয় সৃষ্টি পরস্পর ঐক্য সূত্রে আবদ্ধ ও গতিশীল থাকিয়া সূর্যের মাধ্যমে প্রভাব বিকিরণ করিয়া ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা পূরণ করিয়া লক্ষ্য পথে অগ্রগামী হইতেছে। সূর্যের মাধ্যমে আল্লাহতা'লার স্বক্রিয় ইচ্ছা পরিচালিত হওয়ার কারণেই এই অসাধারণ প্রতাপ ও প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হইয়া থাকে। তাহা না হইলে সূর্যের এমন কোন নিজস্ব মূল্য নাই। যাহা একটি নিরেট ও নিঃস্ক্রিয় গোলক পিণ্ডমাত্র।

দিন, রাত্রির মালীক, আলো এবং আঁধারের নিয়ন্ত্রনকারী আল্লাহ্‌তালা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করিয়াছেন যে, সূর্যের উদয় এবং অস্তের মধ্যে তাঁহার নিদর্শন রহিয়াছে। সৃষ্টির প্রতিটি অনুপরমাণ পরম

করুনাময় আল্লাহ্‌তালার অস্তিত্বের নিদর্শন প্রদান করিতেছে। এখানে সূর্য্যের উদয় অস্তের মধ্যে নিদর্শনের কথা উল্লেখ করিয়া আল্লাহতা'লা দিন রাত্রির প্রভাব, প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষ্য ও পরোক্ষভাবে জড়িত ও পরিচিত বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন মানবের নিকট জাগতিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও পারলৌকিক জীবনের উপর ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের পরস্পর বিপরীত মুখী প্রভাব, প্রতিক্রিয়া এবং প্রতিফল ভোগের দিকে ইশারা করিয়াছেন।

সৌর জগত নিয়া গবেষনার ফলে নূতন নূতন অজ্ঞাত তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে এবং মানবের জীবন যাত্রা সমৃধ্যশালী হইয়া উঠিতেছে। আধ্যাত্মিক জগত নিয়া অনুরূপ গবেষণা করিলে জাগতিক জীবনের সাথে সমান্তরালভাবে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হওয়ার কথা। দুইটি অবস্থা সমান্তরাল রেখায় উপনীত না হওয়া পর্যন্ত দুনিয়াতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কোন উপায় নাই। আল্লাহ্‌তালা উল্লেখিত উপমার মাধ্যমে মানব-জীবনে আল্লাহ্‌র আশীষ এবং ইপ্সিত শান্তি লাভের গভীর হেকমত ও উপায় বর্ণনা করিয়াছেন।

জড় জগতে যেমন দিন এবং রাত্রির সৃষ্টি হইয়া থাকে আধ্যাত্মিক জগতেও অনুরূপ অবস্থা ও ব্যবস্থা রহিয়াছে। জড় জগতে যেমন সূর্যের উদয় অস্তে দিন এবং রাত্রির সৃষ্টি হইয়া থাকে; আধ্যাতিক জগতে নবীর আগমন ও অন্তর্ধানে আধ্যাত্মিকভাবে দিন এবং রাত্রির সূচনা হইয়া থাকে। জড় জীবনে নিদ্রা যেমন মৃত্যুর অভিব্যক্তি; তেমনি সূর্য্য এবং নবীর অন্তর্ধান জড় এবং আধ্যাত্মিক জগতের জন্য মহা প্রলয়ের অভিব্যক্তি। সূর্য্যের অস্তগমনের পর সৃষ্টি জগত আস্তে আস্তে গভীর অন্ধকারের আড়ালে চলিয়া যায়। প্রাণীকুল নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে। সূর্য্যোদয়ে দিবসের সূচনায় সকলই নূতন উদ্দমে জাগিয়া উঠে। নবীর আগমনে আধ্যাত্মিকভাবে নিদ্রা বা মৃত্যুর কুল হইতে জাগরণের সাড়া পড়িয়া যায়। পবিত্র কুরআনের ভাষায় যাহা কেয়ামত বা পুনরুত্থান বলিয়া অভিহিত।

সূর্য্যাস্তের পর দুনিয়ার তলদেশ হইতে আঁধারের লম্বমান কৃষ্ণরেখা সমুহ উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া ক্রমে জ্যোতির শেষ নিদর্শন লালিমা, শ্বেতীমা বিলোপ করিয়া দিয়া গগন ভূবনে অন্ধকারের কৃষ্ণজাল বিস্তার করিয়া গভীর আঁধারের আবরনে সমগ্র ধরনীকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে। আকাশের কুলে ক্ষীন-প্রভ নক্ষত্ররাজি মিটি মিটি করিয়া স্বীয় জ্যোতির প্রভা বিস্তার করিয়া অন্ধকারের বুকে পথের নির্দ্দেশ প্রদান করিয়া থাকে। সূর্য্যের জ্যোতির প্রতিফলনের অভাবে দৃষ্টিশক্তি উভয়ই বিদ্যমান থাকা সত্বেও কোন কিছু দেখা যায় না। নিকটবর্ত্তী বস্তু সমূহ ও অন্ধকারের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া যায়। তখন নিশাচর প্রাণীদের সুযোগ উপস্থিত হয়। দিনের আলোতে আত্মগোপনকারী অন্ধকারপ্রিয় হিংস্র ইতর প্রাণী কুল এবং চোর-ডাকাতের মধ্যে হীনভাবও হিংস্রতা প্রবল হইয়া উঠে। স্রষ্টার বিধানে বিশ্রাম এবং ক্ষয়-পূরনের জন্য অন্ধকার রূপ রাত্রির সৃষ্টি। ইহারা তাহা অগ্রাহ্য করিয়া হিংস্রতা সাধনের হীন উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া অন্ধকারের আড়ালে সুযোগের অন্বেষণ করিতে থাকে।

অন্ধকারও হিংস্রতা ক্রমশঃ গাড় এবং প্রবল হইয়া চরম রেখায় উপনিত হওয়ার পর বিধানানুযায়ী নির্দ্ধারিত নিয়মে পুনঃ ক্ষয়েরদিকে গতি আরম্ভ হয়। আল্লাহ্‌তা'লা রাত্রির এই অংশকে মহিমান্বিত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। প্রহরে প্রহরে রাত্রির অবশান হইতে থাকে। রাত্রির মধ্যান্ত অবস্থা যেন দিবসের দুপুরবেলার অবস্থার কথা জানাইয়া দেয়। অন্ধকারের উপর জ্যোতির বিজয়কাল আসিয়া উপস্থিত হয়। অন্ধকার ভেদ করিয়া দুনিয়ার তলদেশ হইতে আস্তে আস্তে পূর্বগগনে সূর্য্যোদয়ের পূর্বাবাস "সোবেহ সাদেক" উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। প্রভাকরের জ্যোতির সম্মুখে অন্ধকার টিকিতে না পারিয়া পলায়ন করিতে থাকে। সূর্যোদয় গগনে ভূবন জ্যোতির প্রভায় আলোকিত হইয়া উঠে। সূর্য্যের প্রখর জ্যোতির মোকাবেলায় তারকারাজির ক্ষণে জ্যোতি আর দেখা যায় না।

সূর্যোদয়ে চক্ষু ও জ্যোতিষ্মান হইয়া উঠে। মানব অন্তরে অন্ধকার ও হিংস্রতার ভয়ালভাব কাটিয়া আশা ও আনন্দের ভাব জাগিয়া উঠে। রাত্রের বিশ্রাম ক্লান্তি ও ক্ষয় পূরনের পর সকলই নবীন উদ্দমে কর্তব্য কাজে তৎপর হইয়া উঠে। সূর্যোদয়ে দিবসের প্রথম ভাগ মূল্যবান প্রাতঃকাল আরম্ভ হয়। প্রাতকালীন সমীরণ ও সূর্যরশ্মি সৃষ্ট জগতের জন্য স্বর্গীয় সম্ভার বহিয়া আনে। যাহারা গাফেল এবং যথাসময়ে জাগ্রত না হয় তাহারা এই কল্যান হইতে বঞ্চিত থাকিয়া যায়। জাগ্রত হইয়াও যাহারা আলস্যবসতঃ কর্ত্তব্যকাজে উদাসীনতা প্রদর্শন করিয়া থাকে তাহারাও আশীষ হইতে বঞ্চিত হইয়া ক্ষতির সম্মুখীন হইয়া থাকে। অবহেলার ভিতর দিয়া দিবসের এক মূল্যবান অংশ অতিবাহিত হইয়া যাওয়ায় তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের কর্মসমূহ অসমাপ্ত থাকিয়া যায়। তাহারা দুঃখ যন্ত্রনা ভোগ করিয়া থাকে। অপর দিকে কর্তব্য পরায়ন সঙ্গী সাথীগণ সুচারুরূপে করনীয় কাজ সমাধা করিয়া যাত্রাপথে বহুদূর অগ্রগামী হইয়া গিয়াছে লক্ষ্য করিয়া তাহাদের আক্ষেপ ও অনুশোচনা ছাড়া আর কিছুই করিবার থাকে না। কারণ বিগত অবস্থায় ফিরিয়া যাওয়া এবং বিগত সময়কে পুনঃ ফিরাইয়া আনার কোন উপায় নাই। ক্ষয় পূরনেরও কোন ব্যবস্থা নাই।

সূর্যের অস্ত গমনে যেমন দুনিয়ার দিক হইতে আঁধারের কৃষ্ণরেখা উত্থিত হইয়া যেমন জ্যোতির শেষ নিদর্শন লালিমা, শ্বেতীমা বিলোপ করিয়া দিয়া অন্ধকারের আবরণে গগন-ভূবন আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে! তেমনি নবীরূপ সূর্যের অন্তর্ধানে লালিমা, শ্বেতীমার অনুরূপ নবুয়তের জ্যোতির ধারক "তাবেইন" এবং "তাবে-তাবেইনগন" ইহধাম ত্যাগ করিয়া গেলে খেলাফতের বিধান দুর্বল হইয়া মানুষের অন্তর-রাজ্য নবুয়তের জ্যোতির তেজ ও প্রভা হইতে দূরে পড়িয়া যায়। পরস্পরের প্রতি মহব্বত হ্রাস পাইয়া যাইতে থাকে। মুমিনের জমাআত খেলাফতের বিধানের সঙ্গে ঐক্য হারা ও পৃথক হইয়া দুর্ব্বল হইয়া যায়। নবুয়তের জ্যোতির মোকাবেলায় আত্ম গোপনকারী বিতাড়িত শয়তান তখন সুযোগের অন্বেষণে বাহির হইয়া আসে। শয়তানী শক্তির প্রভাবে "নফস" হইতে অন্যায় অহংকার ও আত্মম্ভরিতার ভাব উদয় হইয়া আঁধারের ন্যায় মানবের অন্তররাজ্য কালিমায় আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে। নবুয়তের জ্যোতি হইতে অন্ধকারে নিপড়িত মানব জাতির উপর লোভ-লালসার ব্যাপক আক্রমন চালাইয়া মানবের অন্তঃকে হিংসা, বিদ্বেষের আগুন জ্বালাইয়া জাগতিক ও নৈতিক জীবনকে ধ্বংস করিয়া ফেলিতে থাকে। তখন ধর্মের নামে নানা প্রকার ভণ্ডামী ও বেদাত প্রচলিত হওয়ার কারণে ধর্মের প্রকৃত অবস্থা এবং উদ্দেশ্য বিনষ্ট হইয়া যাইতে থাকে। আল্লাহ্‌র এবাদতের স্থলে লোক দেখানো রিয়াকারীতা ধর্মের বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া বসে। ব্যবহারিক জীবনে ধর্ম-কর্মের কোন সুফল পরিলক্ষিত হয় না। স্বাভাবিকভাবে মানব অন্তরে সত্যের যে আসক্তি ও মর্যাদাবোধ থাকে তাহা নফসের তাবেদারীতে মলিন হইয়া যায়। নবীর শিক্ষা আদর্শ ভুলিয়া দুনিয়ার সুখ-সম্ভুগ নিয়া মত্ত হইয়া পড়ে। আল্লাহ্ প্রদত্ত বৃত্তি সমূহ কল্যানের পথে ব্যবহার না করিয়া অন্যায়কাজে প্রয়োগ করিয়া মনুষ্যত্ব ও ব্যক্তিত্ব হীন হইয়া মানুষ পশুর চেয়েও অধম জীবন যাপন করিতে থাকে। জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হইতে স্খলিত অবস্থায় অন্যায়ের মোকাবেলা করার মত সদ সাহস এবং অন্যায় হইতে উদ্ধার লাভের দৃঢ় ইচ্ছা, আশা হারাইয়া অন্যায় ও হীনতার পঙ্কিলময় গর্বের অতলতলে নিপাতিত অবস্থায় উত্থান শক্তি হারাইয়া ঘৃনীত জীবন যাপন করিতে থাকে। সাধু ব্যক্তিদের কথার কোন মূল্য থাকে না। মানুষের অন্তর হইতে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র প্রতি সত্যিকার বিশ্বাস, ভয় ও প্রেম বিলোপ হইয়া যায়। যাহার প্রতিক্রিয়ার মানুষের কার্য্য-কলাপ পরস্পরের দায়িত্ববোধ ও মহব্বতের সম্পর্কে ধ্বংসের কার্য প্রবেশ

করিয়া সমান জীবনকে বিষাক্ত করিয়া অশান্তি ও ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দেয়। আধ্যাত্মিকতা বর্জিত দুনিয়ার আনন্দ ও স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা নিয়া মত্ত মানুষ অভিশপ্ত শয়তানের কুপরোচনায় অভিশপ্ত হইয়া পড়ে। তাঁহাদের অন্যায় অত্যাচার দুনিয়াবি আল্লার আজাব গজবকে আকর্ষণ করিয়া নামাইয়া আনে ধ্বংসলীলা। মানব জীবনের স্বাভাবিক আনন্দময় গতিছন্দ প্রবাহিত হইতে থাকে উল্টা দিকে। সমাজের স্তরে স্তরে অন্যায় অত্যাচারে তদ্‌স্বর্গীর আজাব গজবে নিপতিত ও নিষ্পেষিত মানবতার করুণ আর্তনাদ উত্থিত হইয়া স্রষ্টার করুণা সিন্ধুকে আলোড়িত ও উত্তোলিত করিয়া তুলিতে থাকে।

অশান্তি ও ধ্বংসের অবস্থা চরম রেখায় উপনিত হওয়ার পর আল্লাহ্‌তালা তাঁহার রুদ্র মূর্তী পরিহার করিয়া ধ্বংসাবশেষের উপর সৎলোকদের দ্বারা নূতন ভাবে দুনিয়া আবাদের ব্যবস্থা করেন। আধ্যাত্মিক বিধানে অশান্তির রজনীর অবশানের দিকে গতি আরম্ভ হয়। পাপরূপ আঁধার বিলোপের পথ ধরে। অধর্ম ও অশান্তির বিলোপের সূচনাকাল আল্লাহ্‌র কালামে "লাইলাতুল কদর" নামে অভিহিত। মহিমান্বিত "লাইলাতুল কদরে" স্বর্গীর আদেশে রুহুল কুদ্‌স (জিব্রাইল (আঃ)) ধরনীতে নবুয়তের রুহএদ. ঐশী বিধান পরিচালিত করিবার নিমিত্ত মহা প্রতাপে অবতীর্ণ হইয়া আসেন।

সত্যের আত্মার অবতরণে আধ্যাত্মিক জগতে এবং দুনিয়ার উপর গভীর প্রভাব এবং মানবজীবনের উপর ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইয়া থাকে। পাপ-রূপ অন্ধকার ভেদ করিয়া আধ্যাত্মিক গগণে নবুয়তের জ্যোতির শিখা উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। আধ্যাত্মিক ভাবে জাগ্রত জ্ঞানী ও সাধু মহাপুরুষগণ জ্যোতির শ্বেত ও রক্তিম আভা এবং আধ্যাত্মিক জগতের আন্দোলন প্রত্যক্ষ করিয়া দুনিয়াতে এক ইনকালাবের শুভ-সংবাদ প্রদান করিয়া থাকেন।

আল্লাহ্‌তালা অভিশপ্ত শয়তানের কবল হইতে মানবতা উদ্ধার করিয়া তৌহিদ প্রতিষ্ঠাকল্পে চিরন্তন বিধানানুযায়ী নবী প্রেরন করিয়া থাকেন। মানবতার অভ্রান্ত আদর্শ, স্রষ্টার প্রেম, করুণা, ক্ষমা ও শান্তির প্রতীক নবী বিপথগামী মানবজাতিকে অশান্তি ও ধ্বংসের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া প্রকৃত জীবনও শান্তি পথের সন্ধান প্রদান করিয়া থাকেন। সত্য ন্যায়নীতি ও প্রগতীশীল আদর্শ প্রতিষ্ঠার পথে নবী এবং নবীর অনুগামীদের সঙ্গে শয়তানি শক্তির প্রভাবে প্রভাবান্বিত অন্যায় আসক্ত এবং প্রাচীন পন্থী, অন্ধ-বিশ্বাসীদের সংগ্রাম ও সংঘাত সৃষ্টি হইয়া থাকে। আল্লাহ্‌তা'লা চিরন্তন বিধানানুযায়ী কালে কালে আপন প্রতাপ ও পরাক্রম দ্বারা তাঁহার মানোনিত মহান প্রতিনিধি নবী এবং নবীর অনুগামী বিশ্বাসীদের জমাআতকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করিয়া সংখ্যা ঘরিষ্ট প্রবল বিরোধি দলের উপর বিজয়ী করিয়া থাকেন। বিরোধিতার মোকাবেলায় নবীর জমাআত উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহন করিয়া থাকে। নবীর শিক্ষা এবং মহান আদর্শের পরশে নবীর অনুগামী আল্লাহ্‌র প্রেমিকদের কার্য্য কলাপে বৈশিষ্ঠ, ব্যক্তিত্বের ছাপ এবং নৈতিক আদর্শ লক্ষিত হইয়া থাকে। আল্লাহ্‌তালা নবী এবং নবীর অনুগামীগণের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতির পরিপেক্ষিতে যোগ্যতানুযায়ী নবীর জমাতের অনুকুলে মোজেজা, কেরামত ইত্যাদি প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

আল্লাহ্‌র করুণা ও আশীষের অধিকারী নবীর অনুগামী আল্লাহ্‌র প্রেমিকদের অন্তরে দুনিয়ার স্বার্থ-হানীর ভয়, লোভ লালসা, কামনা বাসনার দাদ সংযত ও শীতল হইয়া যায়। হিংসা, বিদ্বেষ, আত্মম্ভরীতা, স্বার্থপরতা ইত্যাদি ব্যাধিতে আক্রান্ত জ্ঞানহীন অন্ধ, চলচ্ছশক্তি রহিত খঞ্জ ইত্যাদি অকেজ ব্যক্তিগণ নবীর হেদায়তের মাধ্যমে ঐশী নূরের প্রভায় দৃষ্টিশক্তি ও চলার শক্তি লাভ করিয়া থাকে। বিভিন্ন রোগ নিরাময়কারী সূর্য্য কিরণের ন্যায় হেদায়নের বাণী আত্মিক ব্যাধিগ্রস্তদিগকে রোগ মুক্ত করিয়া থাকে। নবীর শিক্ষা এবং আদর্শের পরশে

তাহাদের অতীতের ব্যাধিগ্রস্ত ও কলংকময় জীবনের অবশান ঘটে। তাহারা মৃত্যুহীন গতিশীল পবিত্র জীবনের অধিকারী হইবার সুযোগ লাভ করিয়া থাকে। অপর দিকে কাহারও ? মধ্যে লেখনী শক্তি, যুক্তিবাদীতা, বাগ্মীতা ইত্যাদি গুণ অদ্বিতীয় প্রকাশ ভঙ্গিমায় বিকাশ লাভ করিয়া থাকে। রুহুল কুদ্দুসের মাধ্যমে নবীর অন্তরে এই সমস্ত গুণ বাজির বীজ পত্তন হয় এবং নবীর মাধ্যমে অপরাপর অন্তরে তাহা সঞ্চারিত হইয়া উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে। নবীর দিল এবং চরিত্র তুলনা মূলকভাবে সমসাময়িক মানব হইতে সর্বাধিক পবিত্র ও যোগ্য থাকে বলিয়া নবী আপন অস্তিত্ব দ্বারা সর্বতোভাবে ঐশী প্রভাব ও প্রেরণা গ্রহন করিয়া কর্মের ভিতর দিয়া আদর্শরূপে তাহা বাস্তবে প্রকাশ করিয়া থাকেন। নবীর অনুগামীগণ আল্লাহ্‌র মনোনিত মহান প্রতিনিধি নবীর কর্মময় জীবনে ও ব্যক্তিত্বে দর্পনের ন্যায় আল্লাহ্‌তালার অস্তিত্বের বিকাশ। আদেশের প্রভাব প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। নবীর মধ্যে ন্যায় পরায়ণতা, ত্যাগ, ক্ষমা, মহব্বত, সততা ইত্যাদি মানবীয় গুণরাজি অর্থাৎ মানবতার সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশ অবলোকন করিয়া নবীর অনুগামীগণ নিজেদের জীবনে তাহা প্রস্ফুটিত ভাবে বিকাশের সুযোগ পাইয়া থাকে।

নবীর আগমণে আল্লাহ্‌র করুণা ও আশীষের দরজা সমুহ উন্মুক্ত হইয়া যায়। সিরাতাল মুস্তাকীমের উপর প্রতিষ্ঠীত নবীর জমাআতের মধ্যে আশীষের ধারা প্রবাহমান থাকিয়া উত্তপ্ত হৃদয়ে শান্ত শীতল করিয়া তুলিতে থাকে। নবীর মাধ্যমে আল্লাহর করুণা ও প্রেমের অধিকারী সৃষ্টির সেবক সাধু মহা পুরুষগণের কর্ম ও ত্যাগের বিনিময়ে সৃষ্ট জগতে কল্যাণ পৌঁছিতে থাকে।

নবুয়তের জ্যোতির মোকাবেলায় মানবের বিবেক রূপ, জ্ঞানের চক্ষু, দৃষ্টি শক্তি লাভ করিয়া থাকে। নেক অন্তকরণ বিশিষ্ট পবিত্র ব্যক্তিগণ যোগ্যতানুযায়ী দিব্যদৃষ্টিতে আধ্যাত্মিক জগতের অলৌকিক ঘটনা সমুহ অবলোকন করিয়া থাকেন। পরবর্ত্তী জীবনের প্রতি তাহাদের বিশ্বাস দৃঢ় হইয়া যায়। নবীর ব্যক্তিত্বের প্রভাব দুর্বলদের অন্তরের দুর্বলতা দুর করিয়া দিয়া কাজের প্রেরণা শক্তি এবং সাহস প্রদান করিয়া থাকে। নবীর বাণী আশার মধ্যে নিশ্চিত বিশ্বাস সৃষ্টি করিয়া দিয়া অনুগামীদের অন্তর হইতে নৈরাশ্যের ভয় দুর করিয় দেয়।

পাপি-তাপির প্রতি করুণা, পাপের প্রতি ঘৃণা বোধ এবং পুন্যের প্রতি আন্তরিক আগ্রহ ও প্রতিযোগিতা নবীর জমাআতকে মর্যাদা ও উন্নতিরদিকে গতিশীল করিয়া থাকে।

আল্লাহ্‌র প্রেমিক নবী আল্লাহ্‌র প্রেমও করুণার নিদর্শন স্বরূপ "ওহীর" মাধ্যমে তাঁহার অনুগামী-গণের জন্য অভয়বাণী ও সুসংবাদ লাভ করিয়া থাকেন এবং বিরুদ্ধবাদীগণের সংশোধনের জন্য সতর্কবাণী প্রদান করিয়া থাকেন। যাহাকে কেন্দ্র করিয়া কালে কালে গড়িয়া উঠিয়াছে নূতন সভ্যতা। সৃষ্টি হইয়াছে নূতন জাতীয়তা। রচিত হইয়াছে ইতিহাস সাহিত্য, বিস্তার লাভ করিয়াছে জ্ঞানের পরিধি। প্রেম ত্যাগের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তৌহিদের শিক্ষা দুনিয়ার বুকে, মানব অন্তরে বিজয় হইয়াছে দ্বীনের প্রভুর কৃপায়। মঙ্গলময় তিনি। স্রষ্টার মনোনিত মহান প্রতিনিধি নবীর শিক্ষা ও আদর্শ পথে মর্ত্তের মানব প্রসংসার অধিকারী হইয়াছে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে। যোগ্য প্রতিনিধিরূপে সঠিক মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হইল মানব জাতির মর্যাদা বিশ্ব সৃষ্টির মাঝে। প্রেমের পথে প্রেমিকের জীবনে ত্যাগের মহিমা বাহিয়া আনিয়াছে প্রেমের উজ্জল নিদর্শন স্বার্থক হইয়াছে। জীবন প্রভুরই ইচ্ছায়; ধর্মের কল্যাণে। তিনিই মালীক দ্বীনের। রক্ষক সকলের।

*

"ফেরেশ্‌তা"

মূল—রফিক আহমদ

ফেরেশতাগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ইসলামের মৌলিক বিধান সমূহের অন্তর্ভুক্ত। পবিত্র কোরান শরীফে আল্লাহর আদেশ রহিয়াছে "কুল্লুন আমানা বিল্লাহে ওয়া মালাএকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রসুলিহি"—অর্থাৎ আল্লাহর উপর ও ফেরেশতাগণের উপর এবং তাঁহার ঐশী পুস্তক সমূহের উপর ও যাবতীয় রসুলগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা বিশ্বাসীর লক্ষণ।

উপরোক্ত ঈমানের উপরই আমলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা সম্ভবপর এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের মাধ্যমেই মানুষ সৎ কর্ম করিবার শক্তি লাভ করিয়া থাকে। অর্থাৎ ঈমানের বৃক্ষকে ফুলে ফলে সুশোভিত করিয়া তুলিবার জন্য আমলের আবশ্যকতাও অপরিহার্য।

হযরত রসুলে করিম (দঃ)-র নিকট প্রশ্ন করা হইয়াছিল "ঈমান কাহাকে বলে?" উত্তরে হুজুর বলিয়াছিলেন, "তুমি আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, ফেরেশতাগণের উপর ঈমান আন, আল্লাহর প্রেরিত সমস্ত রসুলগণের উপর বিশ্বাস রাখ এবং পরকালের উপর ঈমান রাখ।

(বুখারী শরীফ কিতাবুল ঈমান)।

কোরান ও হাদীসের উপরোক্ত উদ্ধৃতি হইতে ইহাই প্রমাণ হইতেছে যে ফেরেশতাগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। তাহা না হইলে ঈমান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

আল্লাহর কোন প্রেরিত মহাপুরুষকে অবমাননা করিলে তাহা আল্লাহকেই অবমাননা করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সেইরূপ ফেরেশতাগণও খোদার দূত বটে। এবং আল্লাহর কোন দূতকে অবমাননা করিলে আল্লাহকেই অবমাননা করা হয়।

মসিহে মওউদ (আঃ) বলেন—"ফেরেশতাগণকে অস্বীকার করিলে মানুষ নাস্তিকতার পর্যায়ে পতিত হয়। (মলফুজাত ৫ম খণ্ড ৩৩৯ পৃঃ)।

ফেরেশতার অভিধানিক অর্থ

আরবী ভাষায় ফেরেশতাকে 'মালাএকা' বলা হয়। আরবী অভিধানে এই শব্দটি 'আলাকা' 'ইয়ালেকা' ও 'মা আলেকুন' হইতে উৎপত্তি হইয়াছে। যাহার অর্থ "রেসালাতুন" رسالة অর্থাৎ বার্তাবহণ কারীকে বলা হইয়া থাকে। এবং অভিধানে 'মালাএকা' শব্দের অর্থ:—

الرواح المجردة من الاجسام

দেহ বিহীন আত্মা যাহাকে অপশারিরী আত্মাও বলা যাইতে পারে। মসিহে মওউদ (আঃ) "তওজিহে মারাম" পুস্তকে 'মালাএকা' শব্দের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন:—

এইরূপ 'মালাএকা' শব্দের অর্থ আল্লাহ্‌র ঐ চেতন-সৃষ্টি, যাহারা আল্লাহ্‌র আদেশ অনুযায়ী আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীবের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়া থাকে। এবং আল্লাহ্‌র বার্তা সমূহ বহন করিয়া মানব গোষ্ঠীর নিকট পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পৌঁছাইয়া দেয়। ইহাতে তাহার নিজের কোন কথা সংযোগ করিবার অধিকার থাকে না। (সিরাতুন নবী ৪র্থ খণ্ড)।

মানুষ ও ফেরেশতা

আল্লাহ্ মানুষকে ভূ-পৃষ্ঠে তাঁহার 'খলিফা' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। ভাল-মন্দ সৎ-অসৎ উভয়বিধ পথ দেখাইয়া তাহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, মানুষ এই পৃথিবীতে একটি নির্দিষ্ট সীমারেখার ভিতর সম্পূর্ণ স্বাধীন। সে সৎ পথে পরিচালিত হইয়া নিজ সাধ্য অনুযায়ী আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করিতে পারে। আবার তাহার ইচ্ছানুযায়ী আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করিয়া বিপদগামীও হইতে পারে। কিন্তু ফেরেশ্‌তাদের অবস্থা তদরূপ নহে। তাঁহারা আল্লাহ্‌র চেতন সৃষ্টি বটে কিন্তু আল্লাহ্‌র কোন আদেশ অমান্য করিবার তাহাদের কোন ক্ষমতাই

নাই। পবিত্র কোরানে আল্লাহ্ বলিয়াছেন— "লা ইয়াস্সুনাল্লাহা মা আমারাহুম ওয়া ইয়াফআলু মা ইউমারুই"—সূরে তাহরীম।

অর্থাৎ—ফেরেশতাগণ একমাত্র আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করিতে বাধ্য। তাহাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র কোন আদেশ অমান্য করিবার কোন ক্ষমতা নাই। পরন্তু তাহারা সব সময় আল্লাহ্‌র হামদ ও গুণ কীর্তনে ব্যাপ্ত রহিয়াছে।

হানাফী সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ ইমাম হযরত মোল্লা আলী কারী সাহেব তাঁহার প্রসিদ্ধ পুস্তক সারহে-ফিকা আকবর এ লিখিয়াছেন।

"ইন্না খাওয়াসাল বাশারে আফজালো মিন খাওয়াসেল মালাএকাতে"—অর্থাৎ-গুণ ও মর্যাদার বৈশিষ্ট্য হিসাবে মানুষ ফেরেশতাগণ হইতে শ্রেষ্ঠ।

ফেরেশতা সম্বন্ধে বিভিন্ন ধর্মের মতবাদ

জগতের বিখ্যাত পার্শী, ইহুদী, হিন্দু, খ্রীষ্টান ধর্ম এবং চীন দেশের বিভিন্ন ধর্মে ফেরেশতার প্রতি বিশ্বাসের কথা বিদ্যমান রহিয়াছে। পবিত্র কোরআনেও সূরে মোমেন-এ হযরত নুহ (আঃ)-এর বর্ণনার ভিতরে উল্লেখ রহিয়াছে যে নূহ্ (আঃ)-কে তাঁহার বিরুদ্ধবাদীগণ বলিয়াছিল যে সেতো আমাদের মতই মানুষ যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করিতেন তবে তিনি আমাদের জন্য কোন ফেরেশতাকে নবীরূপে পাঠাইতেন। ইসলামের পূর্বে অন্ধকার যুগেও ফেরেশতাগণের উপর বিশ্বাস পাওয়া যায়। পবিত্র কোরানে সূরে হাজার—এ উল্লেখ আছে যে কাফেরগণ রসুলে করিম (দঃ)-কে বলিয়াছিল যে, তুমি তো আমাদের মতই মানুষ, আল্লাহ্ সংশোধনের জন্য কোন ফেরেশতা পাঠাইলেন না কেন?

ফেরেশতার সংজ্ঞা

ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী ফেরেশতাগণ আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। তাহারা মরণশীল ও চিরস্থায়ী নহে। খ্রীষ্ট ধর্ম অনুযায়ী 'রুহুল কুদুস' (পবিত্র আত্মার) আল্লাহর অংশ বিশেষ। (যেরূপ পিতা-পুত্র 'রুহুল কুদুস'—তিনে মিলিয়া এক হয়।) কিন্তু ইসলাম এই বিশ্বাসকে অস্বীকার করে। ইসলামের মতে ফেরেশতাগণ আল্লাহর বার্তাবহণ কারী ও দূত হিসাবে মানুষের সংখ্যা যোগসূত্র স্থাপন করিয়া থাকে। বিবি আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) বলিয়াছেন যে, তিনি হযরত রসুলে করিম (দঃ) এর নিকট হইতে শুনিয়াছেন "খুলেকাতিল মালায়েকাতো মিনান্ নূরে" অর্থাৎ আল্লাহ্ ফেরেশতাগণকে তাঁহার নূর হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।

ফেরেস্তাগণ বিভিন্নরূপে ও আকারে মানুষের সম্মুখে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কখনও মানব মূর্তি ধারণ করিয়া মানুষের সম্মুখে আসে।

(বোখারী শরীফ)।

(২) কখনও কখনও পক্ষ বিশিষ্ট মূর্তি ধারণ করিয়া আবির্ভূত হয়। —বোখারী শরীফ।

(৩) ফেরেস্তাগণের মধ্যে পাপ করিবার কোন ক্ষমতা নাই। তাঁহারা উহাই করেন যাহা খোদা আদেশ করিয়া থাকেন।

(৪) ফেরেস্তাগণের কোন সংখ্যা নাই তারা অসংখ্য এবং তাঁদের মধ্যেও শ্রেণী বিভাগ রহিয়াছে।

(৫) তাঁহারা আল্লার আরশ বহন করিয়া থাকে। সদা আল্লাহর গুণ কীর্তন করিয়া থাকে। তাঁহারা বিশ্বাসীদিগকে পাপ হইতে মুক্ত রাখে ও তাহাদের সুখ সমৃদ্ধির জন্য চেষ্টিত থাকে। দিবা রাত্রি তাহারা আল্লাহর প্রসংশা ও গুণ কীর্তনে মগ্ন থাকে।

(৬) ফেরেস্তাদের বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। যথা—

(ক) আল্লাহর ওহি এলহাম বহনকারী ফেরেশতাকে জিব্রাইল বলা হইয়া থাকে।

(খ) মৃত্যুর ফেরেশতাকে আজরাইল বলা হয়।

(গ) জ্ঞান ও মারফতের বহনকারী ফেরেশতাকে মিকাইল বলা হয়।

(ঘ) আজাব বা শাস্তি প্রদানকারী ফিরেশতাকে মালাকুল জেবাল অর্থাৎ পর্বত সমূহের ফেরেশতা বলা হয়। (দ্রঃ বোখারী শরীফ)।

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

ছোটদের পাতা

॥ লেখার মূল্য কত বেশী ॥

বর্তমান যুগের কেন অতীত যুগের কীর্তি বহন হচ্ছে লেখার মাধ্যমে। বর্তমানে আমরা এমন এক যুগে এসে পৌঁছেছি, যেখানে লেখার গুরুত্ব খুব বেশী। সংবাদ পত্র প্রচুর ও বহুল পরিমাণে প্রকাশ হচ্ছে। আমাদের চিন্তা ধারা, আমাদের চাল-চলন আমাদের কর্ম তৎপরতা লেখার দ্বারা আমরা অন্যের নিকট সহজে পৌঁছিয়ে দিতে পারি। লেখাটা এত মূল্যবান যে সহজে নষ্ট বা ক্ষয় হবার সম্ভাবনা নেই। যখন কোরআন শরীফ নাজেল হয়েছিল, তখন সাহাবাগণ লিখে রাখতেন। যার ফলে হুবহু সে কোরআন যাহা রসুল করীমের যুগে নাজেল হয়েছিল এখন পর্যন্ত মণ্ডলীর উপকারার্থে কায়েম আছে এবং থাকবে।

আমাদের নবী হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলেছেন, "পণ্ডিতের কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও পবিত্র।" ইহা হতে আমরা সহজেই লেখার গুরুত্ব ও মূল্য উপলব্ধি করতে পারি। একজন লিখলে অনেকে উপকার লাভ করতে পারে।

ছোটদের মধ্যে যাতে লেখার উৎসাহ জন্মে সে জন্য আমরা পাক্ষিক আহমদীতে "ছোটদের পাতা' নামে একটা নূতন বিভাগ শুরু করেছি। কেহ কেহ এতে সাড়া দিয়েছন। তবে এখনও আশানুরূপ সহায়তা পাচ্ছি না। ছোটদের মনের চিন্তার ঢেউকে লেখার মাধ্যমে বেঁধে রাখার ব্যাপারে মাতাপিতার দায়ীত্ব অনেক বেশী। তাদের প্রাণে একবার লেখার আগ্রহ জাগিয়ে তুললে তা কখনও আর স্তিমিত হবে না বরং তারা আগামী দিনের শ্রেষ্ঠ লেখক বা লেখিকা হিসাবে নিজদের গড়ে তুলবে। আমরা আশা করি মাতা-পিতারা এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে ইসলামের সেবায় তাদের সন্তানদের অনুপ্রাণিত করবেন। ছোট ভাই বোনেরা তোমরা উৎসাহ উদ্দিপনার সঙ্গে লিখতে চেষ্টা কর। আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে

ফেরেশতার অবশিষ্ট্য

মূল কথা এই যে, ফেরেশতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করা ঈমানের অংশ বিশেষ। যাবতীয় পূন্য কাজের প্রবৃত্তি ফেরেশতাগণ দ্বারাই সৃষ্ট হইয়া থাকে। যাহার ফলে মানুষ পূণ্য কাজ করিবার এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের প্রেরণা লাভ করিয়া থাকে। সৌরজগতের যেরূপ চন্দ্র সূর্য গ্রহতারার প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে সেইরূপই মানুষের মন ও মস্তিস্কের উপরও ফেরেশতাগণের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

উপসংহারে এই বলা যায় যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহর চেতন সৃষ্ট। স্বয়ং আল্লাহ তাঁহার নূর দ্বারা তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহর কোন একটি আদেশও লঙ্ঘন করিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। তাহাদের মোট সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেহ জানে না। তাহারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না। তুলনামূলক ভাবে মানুষ হইতে তাহাদের শক্তি সীমাবদ্ধ।

(৭) তাহারা ভবিষ্যতের জ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আল্লাহর মুখাপেক্ষী।

(৮) কার্য নির্বাহের দিক দিয়া তাহাদের কার্য ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে বণ্টন করা হইয়াছে।

(৯) তাহারা আল্লাহর সিফাত ও গুণাবলীর বিকাশের জন্য পাত্র স্বরূপ।

অনুবাদক মৌলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ

★

সহযোগিতা করব (ইনশাল্লাহ্)। কারণ হযরতের পবিত্র বাণী পাঠ করে তোমরা লেখকের যে কত মূল্য তা নিশ্চই বুঝতে পেরেছ। "ভাইজান"

ছোটদের পাতা সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত

আমাদের এক গায়ের আহ্‌মদী ভাই আতাউর রহমান সাহেব ছোটদের পাতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে রাজশাহী হতে লিখেছেন যে, "ছোটদের পাতা পড়ে বেশ আনন্দিত হলাম। এইভাবে প্রত্যেক সংখ্যায় লিখলে মুসলমান ভাই-বোনদের বেশ উপকার সাধিত হবে।"

* * *

'ভাইজান'

প্রথমে সালাম নিবেন। ছোটদের পাতা পড়ে যারপর নাই আনন্দিত হইলাম। ছোট ভাই বোনদের জন্য এটা একটা মহা আনন্দের বিষয় যে, তারাও এখন লিখতে পারবে। এর জন্য আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুণ।

স্বপন, কুষ্টিয়া।

* * *

জনাব,

সম্পাদক সাহেব,

প্রথমে আমার সালাম নিবেন। আহ্‌মদীতে "ছোটদের পাতা" নামে যে নতুন বিভাগ শুরু করেছেন এবং ছোটদের মধ্যে অনুপ্রেরণা জাগাবার জন্য যে ব্যবস্থা করেছেন, তার জন্য অপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

ছোটদের পাতায় যে লেখাগুলি বের হয়েছে সে গুলি খুব ভাল হয়েছে। এইভাবে যদি লিখতে থাকেন তবে আমাদের ছোট ভাই বোনেরা এসব হতে বেশ উপকৃত হতে পারবে।

মোঃ সাদেক,
দুর্গারামপুর

শ্রদ্ধাস্পদেষু 'ম্যানেজার' সাহেব
পাক্ষিক আহমদী

জনাব,

আস্‌সালামু আলাইকুম। আপনারা এ বৎসরের আরম্ভ থেকে 'পাক্ষিক আহমদী'তে আমাদের জন্য 'ছোটদের পাতা' বের করেছেন জানতে পেরে খুব আনন্দিত হলাম। এখন থেকে এই 'ছোটদের পাতা'য় আমাদের অবুঝ মনের সবুজ ইচ্ছে পাখীর মত ডানা মেলতে পারবে—এটা কি কম বড় কথা! আমরা যা জানি, যতটুকু জানি, তা আরো বেশী জানার আগ্রহ নিয়ে এই 'ছোটদের পাতা'য় ব্যক্ত করতে পারব। বড় হয়ে হয়ত আমরা অনেকে জ্ঞানগর্ভ বিষয়ক প্রবন্ধ লিখব। এখন থেকে যদি এর প্রস্তুতি না নেই তবে বড় হয়েও লিখতে পারব না। এখন থেকে এই 'ছোটদের পাতা'য় লিখে লিখে আমাদের কাঁচা হাতকে পাকা করে তুলতে পারব। ধীরে ধীরে এর মাধ্যমেই গড়ে উঠবে আমাদের মানসিক প্রস্তুতি। আপনাদের এই প্রচেষ্টা সত্যিই মহৎ এবং প্রশংসনীয়। আমি আশা রাখি যে, প্রত্যেক আহ্‌মদী ভাই-বোনই এই 'ছোটদের পাতা'টিকে সুন্দর ও সতেজ করে তোলার দায়ীত্ব নেবেন। কারণ একক প্রচেষ্টায় একে সর্বাঙ্গীন সুন্দর করে তোলা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। এতে দরকার পারস্পরিক সহযোগীতা।

এই 'ছোটদের পাতা'টি সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই। এতে একটা 'প্রশ্ন উত্তর' বিভাগ খোলা হলে আরো ভালো হবে। এই বিভাগে ধর্মীয় সংক্রান্ত জ্ঞানবর্ধক বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন থাকবে। যেমন ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) কবে কোথায় জন্ম গ্রহণ করেন, প্রথম খলীফার নাম কি ইত্যাদি কেউ কেউ এসব প্রশ্ন সংগ্রহ করবেন আবার কেউবা উত্তর দিবেন। যারা সঠিক উত্তর দিতে পারবেন তাদের নাম ছাপা হবে। এতে করে আমরা আহ্‌মদী ভাই-বোনেরা অধিকতর উৎসাহবোধ করব এবং যে

সমস্ত আবশ্যকীয় কথা জানিনা তা জানতে পারব। আমাদের জ্ঞান বর্ধিত হবে। আশা করি আমার এ প্রস্তাবটি আপনারা বিবেচনাধীন রাখবেন।

কুদসিয়াবিন্‌তে মীর্জা,
মিরপুর।

* * *

॥ শিক্ষা ॥

—আমাতুল কাইয়ুম (টুটু)

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। জীবনে শিক্ষার প্রয়োজন ও মূল্য অসীম। কোন দেশ বা জাতির সমৃদ্ধির মূলে রয়েছে শিক্ষা। জীবন ও ভাগ্যকে জানিবার ও বুঝিবার তাগিদ অনুভবের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন সর্বজন স্বীকৃত।

নর-নারী উভয়ের জন্য শিক্ষা ফরজ করা হইয়াছে। শিক্ষার বলে মানব জাতি একে অপরকে জানিতে ও চিনিতে পারে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ শিক্ষার উপর নির্ভর করে।

অশিক্ষিত ব্যক্তি প্রায়ই সমাজের ভারবাহী। আজ শিক্ষার ফলে পাশ্চাত্য দেশ সসভ্য ও উন্নত দেশ বলিয়া খ্যাত।

শিক্ষিত ব্যক্তি সমাজের আদরনীয় ও প্রয়োজনীয় ব্যক্তি। তাহাদের দ্বারা দেশের উন্নতি সাধিত হয়।

শিক্ষা সভ্যতার বাহন ও সংস্কৃতির অভিভাবক। আমাদের অতীত বিশ্বাস, ভবিষ্যৎ কল্পনা ও আশা আকাঙ্খা সবকিছুই রূপায়িত হবে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায়।

ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হযরত রসুল করীম (দঃ) বলিয়াছেন,

طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة

অর্থাৎ—জ্ঞানান্বেষণ প্রত্যেক মুসলমান স্ত্রী-পুরুষের জন্য ফরজ। জ্ঞান-অন্বেষণের জন্য তিনি বলেছেন, "শহীদের রক্তের চেয়ে জ্ঞানীর কালি শ্রেয়ঃ।"

اطلب العلم و لو كان فى الصين -

অর্থাৎ—চীন দেশে যেয়েও জ্ঞান অর্জন কর।

"বিজ্ঞান ও জ্ঞানের তথ্যাদি ঘণ্টাখানেক শ্রবণ করা এক হাজার শহীদদের দরজা থেকেও অধিকতর ও—এক হাজার রাত্রির নামাজের হইতে শ্রেষ্ঠ।"

"জ্ঞানী ব্যক্তির বাণী শ্রবণ করা এবং হৃদয়ে জ্ঞানের তথ্যাদি শ্রবণ করা ধর্মসংক্রান্ত কার্যাবলী হইতেও উৎকৃষ্টতর। এমন কি একশত দাসের মুক্তিদানের চেয়ে উৎকৃষ্টতর। জ্ঞানের জন্য এমন উৎসাহদাতা আর কোন ধর্মে আছে কিনা সন্দেহ।

কেবল বিদ্যালয়ের, মহা বিদ্যালয়ের শিক্ষালাভ করিলে চলিবে না। এই শিক্ষার সহিত ধর্মীয় শিক্ষালাভ করাও প্রয়োজন। শিক্ষালাভ করিতে হইলে একটি স্থির লক্ষ্যের প্রয়োজন। লক্ষ্যহীনভাবে ইহার পিছনে ধাবিত হওয়া মানে কাণ্ডারীবিহীন নৌকার ন্যায় চালাইয়া যাওয়া।

শিক্ষার প্রথম ও গুরুবহ ভূমিকা হইল দেশবাসীদের মধ্যে একতা ও জাতীয়তা বোধ জাগ্রত করা।

আসুন, আহমদী ভাই-ভগ্নি আমরা যেন শিক্ষা-দীক্ষায় সকলের উচ্চস্থান লাভ করিতে পারি। শিক্ষা-দীক্ষায় আমরাও যেন অতুলনীয় হইতে পারি। শিক্ষায় বলিয়ান হইয়া আমরা যেন দেশের ও দশের সেবা করিতে পারি সুশিক্ষার ফলে আমরা আমাদের আসল স্বরূপটি প্রকাশ করিতে পারি। আল্লাহ্‌ আমাদের তৌফিক দিন, আমরা যেন দ্বীন ও দুনিয়াবী এলেম লাভ করিতে পারি, আমিন!

* * *

জনাব সম্পাদক সাহেব,

প্রথমে আমার সালাম নেবেন। ছোটদের পাতা পড়ে খুব খুশী হয়েছি। ছোটদের জন্য এটা খুবই ভাল হয়েছে। এর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ যে আপনি ছোটদের মধ্যে লেখার উৎসাহ জাগিয়ে তুলার জন্য সুন্দর ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। বুশরা বেগম, করাচী

॥ আহমদী ছেলে ॥

—বুশরা বেগম

কোন লোক :—খোকা তুমি কি আহ্‌মদী ?

খোকা :—জি হাঁ, খোদাতায়ালার মেহেরবাণীতে আমি অদহ্‌মদী।

লোক :—তুমি খুব ভাল ছেলে। আচ্ছা বলত ; আহ্‌মদী কাহাকে বলে ?

খোকা :—আহ্‌মদী বলে সত্যিকার মুসলমানকে।

লোক :—সাবাস, তুমি ঠিক উত্তর দিয়াছ। আচ্ছা বলত তুমি প্রতি দিন কি কর এবং তোমার কি কি সখ আছে ?

খোকা :—আমি সকালে আযানের সাথে সাথে উঠি ও ওযু করে নামায পড়ি। তারপর কোরআন মজিদের তেলাওয়াত করি। নাস্তা করিয়া স্কুলে যাই ও মনোযোগ দিয়া পড়ি। শিক্ষকদের সম্মান করি, সবসময় তাহাদের কথা মানিয়া চলি। নিজের সাথীদের সাথে মিলিয়া মিশিয়া খেলা করি। খারাপ ছেলেদের সহিত মেলা মিশা করি না। গালি দেইনা। সব সময় সত্য কথা বলি। মাতা পিতার সেবাতেই আনন্দ পাই।

মনচায়, রাবওয়া যাই। এবং সেখানেই থাকি। লেখা-পড়া শিখে দিনের খেদমত করি। এবং সকলকে সত্যের রাস্তা দেখাই। ইসলামকে সমস্ত দুনিয়াতে ছড়িয়ে দেই যেন চতুর্দ্দিকে আহ্‌মদী আর আহ্‌মদী দেখতে পাওয়া যায়। আল্লাহ্‌তায়ালার নাম উঁচু করি। লোকেরা হযরত রসুল করিম (দঃ) এবং হযরত মসিহ্‌ মাওউদ (আঃ) দের গুণ কীর্ত্তন করে। এটাই হলো আমার জীবনের সখ ও কাজ।

লোক :—বেশ, আল্লাহ্‌তায়ালা তোমার হায়াত বাড়িয়ে দিন। ফুলের মতই ফুটো এবং জগদ্বাসীকে ফলদাও।

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর কর্মময় ও সাধনার জীবন

—মুবিনা মোস্তফা (বন্যা)

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর সমগ্র জীবনই কর্মের ও সাধনার জীবন। পবিত্র কোরআনে অনেক বার অনেক স্থানে বলা হয়েছে, আল্লার প্রতি ঈমান আনলেই চলবেনা আমল অর্থাৎ কাজ করতে হবে। হযরত মোহাম্মদের (সাঃ) জীবনে দেখা গিয়েছে, শিশুকাল থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁর জীবন কর্মের এবং সাধনার।

তিনি যখন শিশু বয়সে দুধমা হালিমার কাছে ছিলেন তখন তিনি রাখাল সেজে মেষ চড়াতেন। তারপর যখন মা'র কোলে ফিরে এলেন এবং মায়ের মৃত্যুর পর হলেন চাচা আবুতালিবের বানিজ্য সঙ্গী। আর তাছাড়া তিনি দেখলেন আরবে কোন শাসন নাই, সবাই চায় শাসক সাজতে ফলে গোত্রে গোত্রে মারামারি, যুদ্ধ লেগেই আছে। তাই যৌবনে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তরুন মোহাম্মদ (সাঃ) মানুষের মঙ্গলের জন্য প্রতিষ্টা করলেন হলফুলফজুল বা হিতসাধন সংঘ খাদিজার বানিজ্য সম্ভার নিয়ে গেছেন দূর দেশান্তরে তারপর নবুয়ত প্রাপ্তির পরও তিনি বসে থাকেন না। ইসলাম প্রচারের জন্য গিয়েছেন তায়েফ। তাঁর কর্মময় জীবন শুধু মক্কায়ই সীমাবদ্ধ নয়। তিনি যখন মদীনা গেলেন তখন তিনি একধারে রাষ্ট্রপতি আর একধারে সেনানায়ক আবার সাধারণ কর্মীও। মদীনার মুসলিমদের জন্য মসজিদ নির্মাণে তিনি নিজ হাতে ইট এনেছেন। কোরেশদের সাথে যুদ্ধে নিজে সৈন্য পরিচালনা করেছেন। নিজে খন্দক বা পরিখা কাটার জন্য কোদাল ধরেছেন। জীবনে তিনি ছোট বড় সব কাজই করেছেন। ছোট বলে তুচ্ছ জ্ঞান করেননি বড় বলে পিছপা হননি। তাঁর কর্মজীবন ছিল বিরাট, বিশাল। তিনি ছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কর্মবীর।

হযরতের কর্মজীবনের মত তাঁর সাধনার জীবন ও বিরাট, বিশাল। তিনি যেখানে যে পরিবেশের মাঝে মানুষ হয়ে ছিলেন, সেই সব মানুষ থেকে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ আলাদ। তিনি যেন অন্য জগতের মানুষ। তখনকার আরব ছিল কলহ, যুদ্ধবিবাদে ভরা। মারামারি করা, মিথ্যা বলা তাদের স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। আর তার মধ্যে সেই আদর্শহীন যুদ্ধে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন 'আল-আমীন' বা 'সত্যবাদী' রূপে। ছোটকাল থেকে সৃষ্টির মহিমা দেখে নিজ থেকেই তাঁর মাথা নত হয়ে যেত এক অসীম স্রষ্টার প্রতি। সেই স্রষ্টাকে তিনি কতগুলি মাটির প্রাণহীন মূর্তির মাঝে খুজে পেতেন না। তাই শিশু বয়সে যখন তাঁর সমবয়সীরা খেলত, গান গাইত শিশু মোহাম্মদ (সাঃ) কে দেখা যেত চুপচাপ গভীর চিন্তায় মগ্ন। তারপর তিনি নির্জনে হেরাগুহায় বসে সাধনা করেছেন। সৃষ্টিকর্তাকে পাওয়ার উদ্দেশ্যে শুধু নির্জনে বসেই তিনি সাধনা করেননি, তরুন বয়সে যে সংঘ গড়ে ছিলেন তাতেও ছিল তাঁর অন্যায় থেকে ন্যায়কে বাঁচাবার সাধনা। তিনি বলেছেন, অন্যায় ও অসত্য থেকে দূরে থাকতে কারণ নইলে একদিন তারা সত্য ও ন্যায়কে গ্রাস করবে। তাই এই অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে এবার সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আজীবন সাধনা করে গেছেন। মানুষের কাছ থেকে তার প্রতিদানে পাওয়া শারিরীক যন্ত্রণা তাকে সেই সাধনা থেকে বিরত করতে পারেনি। ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আল্লার নৈকট্য লাভের জন্য তিনি নিজের জীবনকে মনে করেছেন তুচ্ছ। আর তাই শেষ পর্যন্ত সেই সাধক তাঁর সাধনায় জয়ী হয়েছিলেন। সত্য ও ন্যায়কে তিনি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। তিনি ছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কর্মবীর আর একধারে তিনি হচ্ছেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সাধক।

★

॥ মাহ্‌দীর জয় গান ॥

—সরফরাজ এম. এ, সাত্তার

আর কত কাল রবে অচেতন
জাগো ইনসান তুমি।
দ্বীনের মাহ্‌দী আসিয়াছে ভুমে
থেকো নাগো আর ঘুমি।
আকাশ ভুবন রবি শশীগণ
কহিছে মরুর ধূলি।
ইমাম মাহ্‌দী আসিয়াছে ভবে
স্বর্গের দ্বার খুলি।
সাগর সলিল গিরী প্রস্রবন
শাখী তরুলতা গায়।
জাগো এই ঘড়ি করো নাকো দেরী
ডাকিছে দখিনা বায়।
মাহ্‌দীর কথা গেয়ে ফিরে আজি
নিখিল বিশ্ব ভুমি।
আর কত কাল রবে অচেতন
ওঠো ইনসান তুমি॥

নুসরতে এলাহী (খোদার সাহায্য)

মূল—হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)

খোদার মদদ আসে যখন
খোদার প্রেমিক তরে,
ধরা তখন আর এক ধরা
দেখে চোখের' পরে।
বাতাস হয়ে পথের কাটা
করে একাকার।
অগ্নি হয়ে দগ্ধ করে
শত্রু যত তাঁর।
মাটি রূপে পড়ে কভু
শত্রু শিরোপর।
পানি হয়ে তাদের তরে
আনে ভীষন ঝড়।
খোদার কাজ রুখতে পারে
নেইকো মানব জ্বীন
স্রষ্টার কাছে সৃষ্টি তামাম
অস্তিত্ব বিহীন॥

অনুবাদ—কুদসিয়া বিন্‌তে মীর্জা

★

॥ প্রশ্নত্তোর বিভাগ ॥

১। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) কোন সনে জন্মগ্রহণ করেন?

২। তিনি কোথায় ও কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেন?

৩। তাঁর মাতা-পিতার নাম কি?

৪। শৈশবে দুধ পানের জন্য যে ধাত্রীর নিকট তাঁকে দেওয়া হয়েছিল তার নাম কি?

৫। মক্কাবাসীরা হযরতের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে কি কি উপাধি দিয়ে ছিল?

নিয়মাবলী:

(ক) পত্রিকা প্রাপ্তির ৮ দিনের মধ্যে উত্তরগুলো আহ্‌মদী কার্যালয়ে পৌঁছাতে হবে।

(খ) উত্তর প্রদান কারীর নাম, বয়স ও পূর্ণ ঠিকানা অবশ্য দিতে হবে।

(গ) নিম্ন লিখিত ঠিকানায় উত্তর পাঠাতে হবে,

"ভাইজান"
আহ্‌মদী কার্যালয়
৪, বক্‌সী বাজার রোড, ঢাকা—১

বিনামূল্যে বিতরণের পুস্তক

১।	আমাদের শিক্ষা,	হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)
২।	খ্রীষ্টান সিরাজউদ্দীনের	” ”
	চারিটি প্রশ্নের উত্তর	” ”
৩।	রসুল প্রেমে	” ”
৪।	ঐশী বিকাশ	” ”
৫।	একটি ভুল সংশোধন	” ”
৬।	ইমাম মাহদীর (আঃ)-এর আহ্বান	” ”
৭।	আহমদীয়াতের পয়গাম	হযরত মীর্যা বশিরউদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রাজিঃ)
৮।	শান্তি ও সতর্কবানী	হযরত মীর্যা নাসের আহমদ (আইঃ)
৯।	কোরআনের আলো	” ”
১০।	মাহাম্মদী মসীহ্	মৌলবী মোহাম্মাদ
	(ইংরেজী নবীর উত্তরে)	”
১১।	কলেমা দর্শন	”
১২।	হযরত ঈসা (আঃ)	”
	একশত কুড়ি বৎসর জীবিত ছিলেন।	”
১৩।	খ্রীষ্টান ভাইদের উদ্দেশ্যে নিবেদন	”
১৪।	তিনিই আমাদের কৃষ্ণ	”
১৫।	বর্তমান দুর্যোগময় যুগে মানবের কর্তব্য	”
১৬।	পুনর্জন্ম ও জন্মান্তরবাদ	”
১৭।	মহা সুসংবাদ	”

'পরিবেশনে'

জেনারেল সেক্রেটারী

পুঃ পাঃ আঞ্জুমানে আহমদীয়া

৪নং বকসিবাজার, রোড, ঢাকা—১

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

The Holy Quran.		Rs. 20·00
Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1·75
The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8·00
The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
The truth about the split	,,	Rs. 3·00
The economic structure of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs. 1·75
Islam and Communism	,,	Rs. 0·62
Forty Gems of Beauty.	,,	Rs. 2·50
The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
Where did Jesus die ?	J. D. Shams (R)	Rs, 2·00
ইসলামেই নবুয়াত :	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
ওফাতে ঈসা ঃ	,,	Rs. 0·50
খাতামান নাবীঈন ঃ	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2·00
মোসলেহ্ মওউদ ঃ	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার মত পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান
জেনারেল সেক্রেটারী
আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া
৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works.
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635

Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.